ঘণ্টাদার কাবলু কাকা

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
ক লি কা তা ৯

প্রকাশক : শ্রীফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি. আই. টি স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬২
চতুর্থ মুদ্রণ : নভেম্বর ১৯৬৪

সূচী

ঘন্টাদার কাবলুকাকা



ঘন্টাদা বললে, ভীষণ প্যাঁচে পড়ে গেছি রে, প্যালা। চোখে শর্ষের ফুল দেখছি আমি।

—কী হলো তোমার? শর্ষের চাষ করছো নাকি আজকাল? আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, তোমার অসাধ্য কাজ নেই। তুমি পাটের দালালী করেছো, ঝোলা গুড়ের ব্যবসা করেছো, সিনেমায় জনতার দৃশ্যে অভিনয় করেছো—বাজী রেখে কাঁচা ডিম খেতে গিয়ে

বমি করেছো, পোড়ো বাড়ীতে ভূত দেখতে গিয়ে ভির্মি খেয়েছো। শেষকালে কি শর্ষের চাষ আরম্ভ করে দিলে ?

—থাম, মেলা বকিসনি !—নাকটাকে পান্তুয়ার মতো করে ঘণ্টাদা বললে, আমি মরছি নিজের জ্বালায়—উনি ইদিকে এলেন ইয়ার্কি দিতে। হয়েছে কী, জানিস ? আজই খবর পেলুম, বিকেলের গাড়ীতে কাশীর কাবলু কাকা আসছেন।

—সে তো খুবই ভালো কথা !—আমি আরো উৎসাহ বোধ করলুম ঃ কাশী থেকে যখন আসছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু চম্‌চম্‌ আর গজা নিয়ে আসছেন। আমিও খাবো, বিকেলে।

—সে গুড়ে বালি, বুঝলি, সে 'জ্যানারিতে' স্রেফ 'স্যাণ্ড'।—ঘণ্টাদা কথাটার ইংরেজি অনুবাদ করে দিলে ঃ কাশী থেকে গজা চম্‌চম্‌ নিশ্চয়ই আনবেন, কিন্তু সে আর হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছুবে না। মোগল সরাইয়ের আগেই কাবলু কাকা ওগুলোকে সাবাড় করে ফেলবেন !···গলা নামিয়ে ঘণ্টাদা বললে, কাবলু কাকা ভীষণ খেতে ভালোবাসেন, জানিস ? একটা আস্ত পাঁঠা খেয়ে নেন একবারে।

—ল্যাজ-ট্যাজ শিং-টিং সুদ্ধু ?—আমি জানতে চাইলুম।

—চুপ কর্‌—বাজে বকিসনি।···আমাকে একটা ধমক দিয়ে ঘণ্টাদা বললে, তা কথাটা যে একেবারে মন্দ বলেছিস তা-ও নয়। কাবলু কাকা যা খাদক—পাঁঠার শিং তো দূরে থাক, রেঁধে দিলে গলার দড়িগাছটাও খান বোধ হয়। বিশ্বখাদক, বুঝলি প্যালা—বিশ্বখাদক ! তিন দিন থাকবেন। আর এই তিন দিনের মধ্যে আমাকেও খেয়ে যাবেন—এই তোকে বলে দিলুম।

সত্যি বলতে কি, কথাটা বিশ্বাস হলো না। ঘণ্টাদার মতো অখাদ্য জীব আমি দেখিনি। কালোবাজার করে বেশ টাকা জমিয়েছে, কিন্তু একটা পয়সা খরচ করবে না। পাড়ার ছেলেরা

একটা ভালো কাজে চাঁদা চাইতে গেলে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসে। বাজারে গিয়ে মরা মাছ কুড়িয়ে আনে, সস্তায় কেনে পচা আলু। কাবলু কাকা যতো দিক্‌পাল খাইয়েই হোক, ঘণ্টাদাকে খাওয়া তার পক্ষেও সম্ভব নয়!

ঘণ্টাদা একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

—যাই দেখি, বাজারে। সের দুই মাংস, সের তিনেক মাছ আর সের খানেক ঘি কিনে আনিগে। এই তিন দিনে যদি আমার দু'শো টাকা খসিয়ে না যান, তা হলে আমার নামে কুকুর পুষিস, প্যালা।

—তোমার নামে কুকুর পুষলে লজ্জায় সে বেচারা সুইসাইড্ করবে—আমি মনে মনে বললুম। তারপর জিজ্ঞাসা করলুম, তা, তোমারই বা হলো কী, ঘণ্টাদা? তুমিই বা খামোখা কাবলু কাকার জন্যে এত অপব্যয় করছো কেন?

—আরে, করছি কি সাধে। কাবলু কাকার ছেলেপুলে নেই —বিষয়-সম্পত্তিও অঢেল। যদি উইল-টুইল করবার সময়—!

আমি মাথা নাড়লুম: বিলক্ষণ!

—তবে, এই তিন দিনেই আমাকে আদ্ধেক মেরে রেখে যাবেন। এমন করে খেয়ে যাবেন যে, আমার হার্টফেল হওয়াও অসম্ভব নয়। তখন কাবলু কাকার সম্পত্তি পেলেই কি আর না পেলেই বা কি।— রাস্তায় একটা কাকের পালক পড়েছিলো, সেটা তুলে নিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে ঘণ্টাদা বললে, তা আমিও একটা প্যাচ কষেছি, বুঝলি—? আমার বাড়ীতে একখানা ঘোরতর ফিতের খাটিয়া আছে। তাতে অন্ততঃ দু'কোটি ছারপোকার বাস। তাইতেই কাবলু কাকাকে শুতে দেবো। তারপর—

—তারপর যদি চটে গিয়ে উইল-টুইল বদলে ফেলে—তখন?

—না—না, কাশীর লোক, অত ঘোরপ্যাচ বুঝবেন না।'

খেতে পেলেই খুশি। এদিকে আমি ভুরি-ভোজের ব্যবস্থা করবো। খেয়ে কাবলু কাকা মশগুল হয়ে যাবেন—আবার ছারপোকার কামড়ে জেরবার হয়ে পালাতেও পথ পাবে না—অ্যাঁ ?

—তা বটে—তা বটে !—ভেবেচিন্তে আমি মাথা নাড়লুম।

সেই কাকের পালকটা দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে ঘণ্টাদা বাজারে চলে গেল।

আমার দুর্দান্ত কৌতূহল হলো। সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই আমি সেই রোমাঞ্চকর কাবলু কাকাকে দেখতে গেলুম।

দোরগোড়ায় আলুর দমের মতো মুখ করে ঘণ্টাদা দাঁড়িয়েছিল। ঘরের ভেতরে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই ছাখ্। মানুষ নয় প্যালা, —মানুষ নয়। সাক্ষাৎ বক-রাক্ষস।

বক-রাক্ষসটাকে দেখবার জন্যে আমি ঘরে পা দিলুম। একটা টেবিলের ওপরে প্রকাণ্ড একটা বারকোস দেখা গেল, আর তার ওপর দেখা গেল শ'খানেক লুচি। আর কিছু না।

হঠাৎ লুচির স্তূপের ওপাশ থেকে প্রকাণ্ড একখানা হাত বেরিয়ে এসে খান দশেক আন্দাজ একসঙ্গে তুলে নিলে। খচ খচ করে লুচি চিবোবার আওয়াজ পাওয়া গেল···কিন্তু তবু কাউকে দেখতে পাচ্ছি না ; ভৌতিক কাণ্ড নাকি ?

আবার সেই প্রকাণ্ড হাতখানার আবির্ভাব এবং খান পনেরো লুচির তিরোধান। তারপর লুচির পাহাড়টা একটু নিচের দিকে নামতে কাবলু কাকাকে দেখা গেল।

বাপ্···কী চেহারা ! ওজন বোধহয় মন চারেক হবে। মুখখানা একেবারে ঢালাই জালা। চেহারা দেখে মনে হলো, একটা আস্ত পাঁঠা তো তুচ্ছ ব্যাপার···নগদ একটা ঘোড়া খাওয়াও অসম্ভব নয়, কাবলু কাকার পক্ষে।

কিন্তু চেহারা অমন জগঝম্প হলে কী হয়···লোকটির মেজাজ ভালো। আমাকে দেখে একগাল হাসলেন।

—তুমি আবার কে হে? কোথায় থাকো?

আমার হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। কাবলু কাকার হাসি দেখে কেমন সাহস এল গায়ে। বললুম, আমার নাম প্যালারাম বাঁড়ুয্যে, আমি পটলডাঙায় থাকি।

ততক্ষণে ছোলার ডালের মতো মুখ করে ঘন্টাদা আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেখছে লুচির পরমাগতি। ওর একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাসও আমি শুনতে পেলুম।

কাবলু কাকা থাবা দিয়ে আধ সেরটাক কুমড়োর ছক্কা মুখে তুললেন। ঘন্টাদার মুখটাও কুঁচকে-টুচকে প্রায় কুমড়োর ছক্কার মতো হয়ে গেল।

কাবলু কাকা ভরা মুখে বললেন, তুমি এত রোগা কেন?

—আজ্ঞে পালা জ্বরে ভুগি, আর বাসক পাতার রস খাই—

আরে দূর-দূর—পালা জ্বর। জুত মতো খেতে জানলে ও পালা জ্বর ল্যাজ তুলে পালাবে। শোনো, এক কাজ করবে। সকালে উঠে চা খাও? খেয়ো না আর। ওতে কোনো ফুড-ভ্যালু নেই—অনর্থক শরীর নষ্ট। তার চেয়ে ভোরে উঠেই একপো খাঁটি গাওয়া ঘি চোঁ চোঁ করে খেয়ে নেবে।

—এক পোয়া খাঁটি গাওয়া ঘি!—আমার চোখ কপালে চড়লো।

—এ আর বেশি কি? আমি তো আধসের করে খাই। ওরে ঘন্টা, আমার ঘিয়ের ব্যবস্থা করে রাখিস, কাল। মনে থাকবে?

ঘন্টাদা মাথা নাড়লো। মনে থাকবে মানে? সারারাত বেচারার ঘুম হলে হয়।

—আর শোনো, হুবেলা হুটো করে মুরগীর রোস্ট্—সেরটাক দাদখানি চালের ভাত—আর হু' সের করে হুধ খাবে। তুমি ছেলে-মানুষ—তাই লঘু পথ্য দিলুম। আমি ছ'টা করে মুরগী খাই, তিন সের চালের ভাত লাগে আর ছ' সের করে হুধ খেয়ে থাকি। ঘন্টা, মনে থাকবে তো ?

ঘন্টাদার হাত-পা কাঁপছিল। গলা দিয়ে কেমন একটা আওয়াজ বেরুলো তার। ওর হয়ে আমিই জবাব দিলুম : নিশ্চয় থাকবে। হাজার বার থাকবে। ঘন্টাদার মেমারি খুব ভালো।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ঘন্টাদা ধরা গলায় আমায় বললে—কি রকম বুঝছিস্, প্যালা ?

—সঙ্গীন।

—খাওয়ার যা লিষ্টি দিচ্ছে, জগুবাবুর বাজারে কুলুবে না—গড়িয়াহাট মার্কেটে যেতে হবে। এই তিন দিনেই আমি ফতুর হবো, প্যালা—আমায় রাস্তায় দাঁড়াতে হবে।

ইচ্ছে হলো বলি, কালোবাজারী করে কয়েক লাখ টাকা তুমি জমিয়েছ, কাবলু কাকাই হচ্ছে তোমার আসল দাওয়াই। কিন্তু অনর্থক ঝগড়া করে কি হবে ?

ঘন্টাদা মুড়িঘন্টর মতো মুখ করে বললে, তবে সেই হুর্ধর্ষ খাটখানা আছে, আর হুর্ধর্ষ ছারপোকা আছে। এখন ওরা যদি ম্যানেজ করতে পারে—তবেই।

—হ্যাঁ, আপাততঃ ওরাই তোমার ভরসা। বলে ঘন্টাদার কাছ থেকে আমি বিদায় নিলুম।

সকালে উঠে সবে লজিকের বই খুলে বসেছি। কী যে মুশকিল—ওই 'বার্বারা সিলারেন্ট' আমার কিছুতেই মনে থাকে না।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে—ঘন্টাদা।

ঘটাদার মুখখানা তখন ডিমের কারীর মতো হয়ে গেছে। কেঁদে ঘটাদা বললে—প্যালা, সর্বনাশ হয়েছে। এবার আমার ফাঁসি হবে।

—বলো কি? খাওয়ার বহর দেখে রেগে-মেগে তুমি কাবলু কাকাকে খুন করে ফেলেছো নাকি?

—জানিস তো, আমি একটা আরশোলাও মারতে পারিনে।

—তাহলে খামোখা তোমার ফাঁসি হবে কেন?

—বরাত প্যালা—স্রেফ বরাত। কাবলু কাকা মারা গেছেন।

—অ্যাঁ!

—তা ছাড়া কী আর? ওই দু' কোটি ছারপোকা, জানিস তো? ওদের হাতে কারুর রক্ষা আছে? নির্ঘাত ওদের কামড়ে কাবলু কাকা পটল তুলে বসেছেন। এই ছাখ্ না—সকাল থেকে দু' ঘণ্টা দরজায় ধাক্কা দিয়েছি, জানলার ফাঁক দিয়ে পিচকিরি করে বরফ জল দিয়েছি গায়ে, তবু নট্ নড়ন-চড়ন, কিস্সু না।

—তবে পুলিশে খবর দাও!

—পুলিশ! ওরে বাবা! এমনিতেই ওরা দু' বার আমার বাড়ী সার্চ করেছে, আমি নাকি চায়ের সঙ্গে চামড়ার কুচো মেশাই। এখনো ধরতে কিছু পারেনি বটে, কিন্তু নেক নজরটা তো আছে! নির্ঘাত বলবে, চক্রান্ত করে এই ভয়ঙ্কর খাটিয়ায় শুইয়ে আমি কাবলু কাকাকে খুন করিয়েছি। তখন ফাঁসি না হোক—বিশ বছর জেল আমার ঠেকায় কে!

তোমাকে জেলে রাখলে দুনিয়ার অনেক উপকার হবে—আমি মনে মনে বললুম। মুখে সাহস দিয়ে বললুম—চলো দেখি, যাই একবার। বুঝে আসি ব্যাপারটা।

—যেতে যে আমার পা সরছে না, প্যালা।

—তবু যেতেই হবে।—আমি কঠোর হয়ে বললুম—সেই ভয়াবহ খাটে শোয়াবার সময় মনে ছিল না? চলো বলছি—আমি প্রায় জোর করে ঘণ্টাদাকে টেনে নিয়ে গেলুম।

কিন্তু বসবার ঘরে ঢুকে আমরা ভূত দেখলুম।

ভূত নয়—সশরীরে কাবলু কাকা বসে। সামনে একটা কাঁচের গ্লাস—তাতে আধ সের আন্দাজ গাওয়া ঘি। একটু একটু করে পরম আরামে চুমুক দিচ্ছেন কাবলু কাকা।

আমাদের দেখেই তিনি হাসলেন। বললেন, এই যে ঘণ্টা—কোথায় গিয়েছিলি? আঃ—কাল রাতে যা ঘুমিয়েছি—সুপার্ব্। তাই উঠতে আজ একটু দেরীই হয়ে গেল।

ঘণ্টাদা একবার হাঁ করলো। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরুলো না তার।

কাবলু কাকা ঘিয়ের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন—চর্বি একটু বেশি হয়েছে শরীরে—রাত্তিরে তাই ভালো ঘুম হয় না। কেমন গা জ্বালা করে। কিন্তু কাল সারারাত কারা যেন মোলায়েম ভাবে গা চুলকে দিয়েছে। সে কি আরাম! এক বছরের মধ্যেও আমার এমন নিটোল ঘুম হয়নি। তাই উঠতে একটু দেরীই হয়ে গেল আজ। আমি ভাবছি কি—জানিস ঘণ্টা? তিন দিন কেন—মাস-খানেকই থেকে যাবো তোর এখানে।

হঠাৎ গোঁ গোঁ করে আওয়াজ। ঘণ্টাদা পপাত-ধরণীতলে।

—কী হলো? ঘণ্টার আবার মৃগী আছে নাকি?

আমি বললুম—মৃগী নয়। আপনি একমাস ওর কাছে থাকবেন জেনে আনন্দে মূর্ছা গেছে।

জার্নি বাই কার



আমি, নেড়া, গজা, ভজা আর ন্যাদা—এই পাঁচজনে মিলে আমরা বাবা ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরে পিকনিক করতে গিয়েছিলুম। স্টেশন থেকে নেমে আরো দু' মাইল রাস্তা, কিন্তু জায়গাটি ভারী খাসা। বাবা ষণ্ডেশ্বরের একটা পুরোনো মন্দির, সামনে বাঁধানো ঘাটওয়ালা দীঘি, দীঘির চারিধারে অনেক গাছ-টাছ, নানা রকমের পাখি-টাখি। সেখানে আধপোড়া খিচুড়ি আর আধসেদ্ধ তরকারী

রান্না করে খেয়ে, হাঁড়ি-ফাড়ি ভেঙে যখন আমরা আবার স্টেশনের দিকে যাব-যাব ভাবছি, তখন হঠাৎ ভঁপ্—ভঁপ্,—ভঁপ্।

দেখি, সামনের খোয়া-ওঠা বিচ্ছিরি রাস্তাটায় একটা কালো-কালো গাবদা চেহারার ঝরঝরে পুরোনো মোটর গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে। যে ভদ্রলোক গাড়ীটা চালাচ্ছিলেন, তিনি গলা বের করে আমাদের জিজ্ঞেস করছেন, খোকা তোমরা কী করছ এখানে?

ভদ্রলোকের চোখে কালো চশমা, চেহারা বকের মতো। রোগা, মাথার চুলগুলো যেমন খাড়া খাড়া, নাকটা আবার পাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা। দেখে একদম ভালো লাগে না। হ্যাদা গম্ভীর হয়ে বললে, আমরা এখানে পিক্‌নিক্ করতে এসেছিলুম।

ভদ্রলোক বললেন, ভেরি গুড্।

গজা আরো ভারিক্কী চালে বললে, আমরা এখানে ছুটির দিনটা এন্‌জয় করতে এসেছিলুম।

ভদ্রলোক এবারে বললেন, ভেরি ভেরি গুড্। তা তোমরা কোথায় থাকো?

আমরা বললুম, চাঁইবাসা।

ভদ্রলোক ভারী খুশি হয়ে বললেন, আরে আমিও তো চাঁইবাসায় থাকি।

নেড়া বললে, তা যান। মোটরে চেপে গড়গড়িয়েই চলে যান। চাঁইবাসা যেতে কারো কোনো বারণ নেই।

—আহা, আমি তো যাবই!—তিনটে পোকা-ধরা দাঁত বের করে ভদ্রলোক হাসলেন: কিন্তু তোমরা যাবে না?

—যাব বই কি। সন্ধ্যে ছ'টার ট্রেন ধরব আমরা!

—তার মানে এখন দু' মাইল রাস্তা ঠ্যাঙাবে, তারপর আরো

এক ঘণ্টা বসে থেকে রেলে চাপবে? আর রেলে যা ভিড়। হয়তো তিনজন উঠবে, দু'জন উঠতেই পারবে না। তা ছাড়া গাড়ির কামরাও কি কম বিপজ্জনক? চোর, জুয়াচোর ও পকেটমার নিকটেই আছে—জানো তো?

ভজা বললে, আজ্ঞে জানব না কেন—সবই জানি। কিন্তু যেতে তো হবেই।

—নিশ্চয় যেতে হবে। তা আমার এই গাড়ীটায় চেপে বসলে কেমন হয়?

—আপনার গাড়ীতে?

ভদ্রলোকের টিকটিকির মতো শুকনো মুখের ভেতর থেকে আবার তিনটে পোকা-খাওয়া দাঁত বেরিয়ে এল: একসঙ্গে মিলে বেশ গল্প করতে করতে যেতে পারি। তোমাদের এক পা-ও হাঁটতে হবে না আর সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবে চাঁইবাসায়। চোর জুয়াচোর পকেটমার কেউ তোমাদের কিছুই করতে পারবে না।

অবশ্য করবারও কিছু নেই, কারণ পাঁচজনের ফিরে যাওয়ার রেলভাড়া ছাড়া ট্যাঁক আমাদের গড়ের মাঠ। তবু মোটরে যাওয়ার সুযোগ পেলে আর কে ছাড়ে? যদিও গাড়ীটা দেখতে তেমন ভালো নয়, কি রকম কালো আর ঝরঝরে, তবু মোটরে চড়ে রাজার হালে যেতে কী আরাম! লোকের মুখের সামনে দিয়ে ভোঁক-ভোঁক করে ধোঁয়া আর ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছি —সবাই তাকিয়ে থাকবে—সামনে থেকে গোরু ছাগল পালিয়ে যাচ্ছে, গেঁয়ো মানুষগুলো বলছে—সর সর, মোটর গাড়ী আসছে! খুব কায়দা করে যাওয়া—যাকে বলে!

ভদ্রলোক আরো মিঠে গলায় বললে, উঠে এসো—উঠে এসো।

বেশ গল্প করতে করতে আরামসে চলে যাওয়া যাবে।

—বেশ, চলুন তবে।

ভদ্রলোক অমনি হাত বাড়িয়ে ক্যাঁচৎ করে গাড়ীর দরজা খুলে দিলেন, আর আমরা টপাস টপাস করে তক্ষুনি উঠে পড়লুম। দু'জন সামনে, তিনজন পেছনে। আমি আর হ্যাদা ভদ্রলোকের পাশেই বসে পড়লুম। আর অমনি ঘ্যারর্-ঘ্যারর্ ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ তুলে গাড়ীটা চলতে শুরু করে দিলে।

অবিশ্যি সীট্-টীটগুলো তেমন ভালো নয়, গদীগুলোতে তাপ্পি মারা, বসে যে খুব আরাম হচ্ছিল তা-ও নয়। তবু মোটর গাড়ী ইজ অলওয়েজ মোটর গাড়ী। ভেতরে নানারকম আওয়াজ হচ্ছে, থেকে থেকে শীতের কাঁপুনি লাগা বুড়ো মানুষের মতো আচমকা ঝেঁকে উঠছে—তবু বিকট হর্ন বাজিয়ে, চারদিকের লোক-গোরু-ভেড়া-কুকুর-ছাগল তাড়িয়ে বেশ যাচ্ছিল। হ্যাদা কাবা করে বললে, জার্নি বাই এ কার। কী চমৎকার!

আমি বললুম, হু, অতি মনোহর!

ভজা বললে, চারদিকে কী অপরূপ তরুরাজি!

গজা বললে, কী মনোরম বিহঙ্গসমূহ!

মনোরম বিহঙ্গ তেমন দেখা যাচ্ছিল না, এদিক-ওদিক দুটো-একটা চড়ুই-শালিক ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু মোটরগাড়ীতে চাপলে এ-সব ভালো ভালো কথা বলতে হয়, নইলে প্রেষ্টিজ থাকে না। নেড়া তো দস্তুরমতো ভাবে মাতোয়ারা হয়ে বিচ্ছিরি বেসুরো গলায় গানই ধরে দিলে:

'অরুণ প্রাতের তরুণদল
চল্ রে চল্ রে চল্—'

সেই টিকটিকির মতো মুখওলা কালো চশমা-পরা রোগা

ভদ্রলোক সেই যে আমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কথা বন্ধ করলেন, আর তাঁর সাড়াশব্দ নেই। খালি ঝকর ঝকর করে গাড়ী চালাচ্ছেন আর ভ্যাঁপাক্ ভ্যাঁপাক্ করে হর্ন দিচ্ছেন। মাইল পাঁচেক বোধ হয় এই রকম কাটল। তারপর—

তারপর সামনে একটা শুকনো নদী। রাস্তাটা তার মধ্যে গিয়ে নেমে তারপর আবার একটা উঁচু ডাঙায় গিয়ে ঠেলে উঠেছে। গাড়ীটা ঝাঁকুনি খেতে খেতে গড়গড়িয়ে বেশ নদীতে নেমে গেল, এক আঁজলা জল আর একরাশ নুড়ি পেরিয়ে নদীর এপারেও চলে এল, তারপর উঁচু ডাঙাটার সামনে এসেই ক্যাচ্যাং! মানে ডেড্ স্টপ!

আমরা বললুম, কী হলো মশাই, থেমে গেল যে!

আবার পোকা-খাওয়া তিনটে দাঁত বের করে ভদ্রলোক হাসলেন, এই ইয়ে—ক্লাচ্টা ঠিক ধরছে না মনে হচ্ছে। তোমরা যদি নেমে একটু—

—মানে, ঠেলতে হবে?—আমি ব্যাজার হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

—নইলে, ইয়ে—মানে গাড়ীটা অতখানি উঠতে পারবে মনে হচ্ছে না। মানে, আমি স্টিয়ারিং ধরছি, তোমরা পাঁচজন রয়েছ, ঠেলে একটু তুলে দাও—

—নিশ্চয়—নিশ্চয়—বলে গজা লাফিয়ে পড়ল। আমাদের দলে ও-ই সব চাইতে জোয়ান, জিম্ন্যাস্টিক করে, এসব ঠেলাঠেলির ব্যাপারে ওর বেশ উৎসাহ আছে।

কী করা, আমরাও নামলুম। ভদ্রলোক বিনি পয়সায় আমাদের মোটর গাড়ীতে চাপাচ্ছেন, তাঁর জন্য অন্ততঃ এটুকু না করলে কি আর ভদ্রতা থাকে!

অতএব—'মারো জোয়ান হেঁইয়ো! আউর থোড়া হেঁইয়ো!

সাবাস্ জোয়ান—হেঁইয়ো !'

খাড়া পাড়ি, ঠেলতে গিয়ে পাঁচজনের স্রেফ কালঘাম ছুটে গেল। মনে হলো, পেটের আধপোড়া খিচুড়ি আর আধসেদ্ধ তরকারী একেবারে গলায় উঠে আসছে। তবু 'জয় বাবা ষণ্ডেশ্বর' বলে চীৎকার ছেড়ে আমরা গাড়ীটাকে একেবারে পাড়ির ওপর তুলে দিলুম।

ঘাম-টাম মুছে, হাঁপিয়ে-টাপিয়ে নিয়ে আমরা গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি—ভদ্রলোক হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। বললেন, আরে আরে, উঠছ কেন ? আমি তো চাঁইবাসা যাব না—যাচ্ছি ট্যাক-খালি। স্রেফ অন্যদিকে।

—তার মানে ?—হ্যাদা চেঁচিয়ে উঠল ঃ তবে আমাদের গাড়ীতে ওঠালেন কেন ?

—নইলে পাড়ির ওপর ঠেলে তুলত কে ? বলেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে তিনটে পোকা-ধরা দাঁতে হেসে ভদ্রলোক বললেন ঃ গাড়ী ঠেলবার জন্যে কি আর তোমরা সঙ্গে আসতে ? এখন বাঁদিকে মাইল তিনেক হাঁটলে একটা স্টেশন পাবে, আর যদি 'অরুণ প্রাতের তরুণদল' গাইতে গাইতে জোর পায়ে হেঁটে যাও, তা হলে ঘণ্টা তিনেকের ভেতরে চাঁইবাসাই পৌঁছে যাবে। টা—টা—

গজা গর্জন করে বললে, জোচ্চোর ! আমাদের চাঁইবাসায় পৌঁছে না দিয়ে—বলেই, লাফিয়ে উঠতে গেল গাড়ীতে। কিন্তু তার আগেই গজার মুখে একরাশ দুর্গন্ধ ধোঁয়া আর এক খাবলা ধুলো ছড়িয়ে ঝকর ঝকর ঝকাং ঝকাং করতে করতে সেই ঝরঝরে গাবদা গাড়ীটা ত্রিশ মাইল স্পীডে জঙ্গলের রাস্তায় হাওয়া হয়ে গেল।

আর অনেক দূর থেকে যেন একবার ভেসে এল ঃ থ্যাঙ্কিউ—টা—টা—

টিকেট



গোপেশবাবু পাগল হয়ে গেলেন।

পাগল হওয়ার পাত্র তিনি নন—বলাই বাহুল্য। খুব ঠাণ্ডা মাথার লোক, বেজায় হিসেবী। আর এতই হিসেবী যে বাড়ীর চাকর বাজার করে এনে পাঁচ পয়সার হিসেব ভালো করে দিতে পারেনি বলে—তার মাস মাইনের তিন টাকা কেটে তাকে তাড়িয়ে দিলেন তিনি।

যেমন অগাধ টাকা, তেমনি কৃপণ। একজোড়া জুতোয় পাঁচ বছর চলে, একটি জামায় এক বছর। ছেলে সস্তায় একটা গোটা ইলিশ কিনে এনেছিল বলে রেগে আগুন।

'অ্যাঁ—একটা আস্তো ইলিশ। পাঁচ টাকা দিয়ে! তুই তো আমায় ফতুর করবি দেখছি। বেরো—এক্ষুনি বেরিয়ে যা বাড়ী থেকে—'

চটবার কথাই। যে বাড়ীতে হপ্তায় একদিন দু'শো গ্রাম কুচো চিংড়ি আসে, সেখানে একটা গোটা ইলিশ! ছেলে রেগে-মেগে মিলিটারীতে চাকরি নিয়ে হায়দ্রাবাদে রওনা হলো। গোপেশবাবু বললেন, 'বাঁচা গেল।'

এ হেন গোপেশবাবু পাগল হয়ে গেলেন। কিন্তু কেন গেলেন, সেইটেই বলি।

সেদিন বেলা এগারোটা নাগাদ তিনি বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। কাগজটা পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে আনা—নিজে অবশ্যই তিনি পয়সা দিয়ে কাগজ কেনেন না।

এমন সময় একটি লোক। গায়ে ময়লা হাফ শার্ট, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পরনে হাঁটু পর্যন্ত ছোট ধুতি এবং পায়ে জুতো নেই। রং ঘোর কালো, রোগা চেহারা।

দেখেই গোপেশবাবু বুঝে নিলেন।

'মাপ করো বাবা, এখানে কিছু হবে না।'

লোকটি বললে, 'ভয় পাবেন না—সাহায্য চাইতে আসিনি।'

'তবে কী জন্যে? চাকরি? আমার বাড়ীতে কাজের লোক দরকার নেই এখন।'

'আজ্ঞে আমি চাকরি চাই না।'

'তবে!'—আশ্চর্য হয়ে গোপেশবাবু বললেন, 'আমাকে দেখতে

এসেছো নাকি ?'

লোকটি ফিক করে হাসল : 'আজ্ঞে দেখবার মতো লোক তো আপনি বটেনই। করতেন ফুটপাথে আলু বিক্রি—এখন সাতখানা বাড়ীর মালিক। একেই বলে কর্মবীর! আপনার মতো লোককে দেখলেও তো পুণ্যি হয়।'

গোপেশবাবু ভাবলেন খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু ফুটপাথে আলু বিক্রির কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া তাঁর ভালো লাগল না।

বললেন, 'ঠিক আছে—ঠিক আছে—দর্শন তো হলো। এবার কেটে পড়ো।'

সে বললে, 'জলেই জল বাধে—টাকাই টাকা আনে। একখানা লটারীর টিকিট কিনবেন স্যার! আপনি কপালে লোক, নির্ঘাত পেয়ে যাবেন।'

লটারীর টিকিট! শুনেই গোপেশবাবু শক্ত হলেন। তিনি এ সবে বিশ্বাস করেন না। আর কোনো কারণ নয়, তাঁর ধারণা ওগুলো স্রেফ ধাপ্পাবাজি। ওদের সব নিজেদের লোকের সঙ্গে সাট থাকে—তাদেরই দিয়ে দেয়। আর যত বোকারা আশায় আশায় টিকিট কিনে টাকা নষ্ট করে।

'অ, তুমি বুঝি লটারীর এজেন্ট? দোকান বসিয়ে কুলোয় না—তাই বাড়ী বাড়ী হানা দাও? যাও—যাও—ওসবের মধ্যে আমি নেই।'

'না স্যার—আমি এজেন্ট নই। কাল একটাকা দিয়ে একটা কিনেছি। কিন্তু বেকার লোক স্যার—আজ দেখছি এ বেলা যে দু'খানা রুটি কিনে খাব তারও সংস্থান নেই। সেই টিকিটটা আপনাকে বেচতে চাই—পকেট থেকে একটা টিকিট বের করল : 'এক্স্-৫৮৮—'

'লটারীর টিকিট ? আমি কিনব না—বেরোও।'

'স্যার, রাস্তার গণৎকার বলেছিল, এটা লাকি নাম্বার—লাগবার চান্‌স্‌ আছে। আপনি কপালে লোক, পেয়ে যাবেন। নিয়ে নিন। 'এক্‌স্‌-ফাইভ এইট্‌ এইট—'

'রাস্তার গণৎকার ? জোচ্চোর !'

'স্যার, অত অবিশ্বাস করতে নেই। কিসে যে কী হয় বলা যায় না। নিতান্তই খিদের জ্বালায় এটা আপনাকে বেচতে এসেছি। বেশ—এক টাকা না দেন, বারো আনাই দিন।'

'বেরোও।'

'আজ্ঞে আট আনা ? ছ'আনা ? অন্ততঃ চার আনাই দিন তা হলে—খিদেয় ভারী কষ্ট পাচ্ছি স্যার—'

'গেট আউট—গেট আউট।'

ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করলেন গোপেশবাবু। লোকটা হকচকিয়ে নেমে গেল রাস্তায়।

ঠিক সতেরো দিন পর। ঠিক বেলা এগারোটা। পাশের বাড়ী থেকে চেয়ে আনা কাগজটা পড়তে পড়তে—

হঠাৎ প্রবল একটি লাফ।

সেই লটারীর ড্র ! এবং প্রথম প্রাইজ—তিন লক্ষ টাকা—এক্‌স্‌-ফাইভ এইট্‌ এইট্‌ জিরো সেভেন। অবশ্য, ফাইভ এইট্‌ এইট্‌ পর্যন্তই শুনেছিলেন গোপেশবাবু—লোকটাকে আর পাত্তাই দেননি।

কিন্তু কে বলতে পারে যে, তারপরে জিরো সেভেন ছিল না !

আর রাস্তার গণৎকার বলেছিল, লাকি নাম্বার। লোকটা বলেছিল, আপনি কপালে লোক—পেয়ে যাবেন।

'গেল—গেল—গেল আবার তিন লক্ষ টাকা—' ডুকরে কেঁদে

উঠলেন গোপেশবাবু।

দৌড়ে এল বাড়ীসুদ্ধ লোক। চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে রাস্তায় বেরুলেন গোপেশবাবু: 'ধরো—খোঁজো সেই লোকটাকে—খাঁকি হাফ শার্ট—রং কালো—রোগা—খেতে পায় না—'

কিন্তু পনেরো দিন আগে যে এসেছিল, আজ আর কে ধরবে তাকে কলকাতার রাস্তায়? বরং গোপেশবাবুকেই জাপটে ধরতে হলো সবাইকে, নইলে একটা ডবল ডেকারের তলায় চাপা পড়তেন ভদ্রলোক।

মুখে ফেনা তুলে চ্যাঁচাচ্ছেন তখনো: 'ধরো লোকটাকে—আমার তিন লাখ টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল।'

এখন গোপেশবাবু বদ্ধ পাগল। মানে—দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখতে হয় তাঁকে।

পরের পয়সায়



একেবারে সময় মতো এসে পড়েন পুণ্ডরীকবাবু। যাকে বলে তাক বুঝে।

আমার ছেলেবেলার বন্ধু সুধীর ঘোষের একটা বড়ো ছাপাখানা আছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যের পর আমি সেখানে গল্প-টল্প করতে যাই। সুধীরের প্রেসের উলটো দিকে এ তল্লাটের একটা নামকরা রেস্তোরাঁ রয়েছে। আমি গেলে সুধীর প্রায়ই না খাইয়ে ছাড়ে

না। কখনো গরম কাটলেট আনায়, কখনো পুডিং, কখনো ওমলেট। সুধীর নিজে খেতে ভালোবাসে, খাওয়াতেও।

দোতলায় ওর অফিস ঘরের নিরালায় আমাদের খাওয়া চলে, আড্ডাও হয়। আর কী আশ্চর্য, যেই বেয়ারা খাবারের ট্রে-টা নিয়ে ঘরে এল, অমনি তার পেছনে ঢোকেন পুণ্ডরীকবাবু। পুণ্ডরীক ভট্চায।

এ পাড়ায় থাকেন না, থাকেন বাদুড় বাগানে। ছাপাখানার সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই। মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি করেন, অন্য সময় ইন্শিয়োরেন্সের দালালী করেন। কী সূত্রে, কবে যে সুধীরের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল, সুধীরও মনে করতে পারে না সে-কথা। কিন্তু পুণ্ডরীকবাবু ঠিক জেনে ফেলেছেন আমি এলেই খাবার আসবে। এবং খাবার এসে পৌঁছোনো মাত্র—

'এই যে সুধীরবাবু, ভালো তো?'—মুখের কাঁচাপাকা দাড়ির ভেতর দিয়ে দাঁতের ছটা বেরিয়ে আসে তাঁর: সুকুমারবাবুর খবর সব ভালো?'—বলেই চেয়ার টেনে বসে পড়েন, তারপর নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে বলেন, 'বাঃ, কী এল? পুডিং নাকি? বেড়ে গন্ধটি বেরিয়েছে তো? পুডিং খেতে আমি ভীষণ ভালোবাসি মশাই।'

পরের অবস্থা বুঝতেই পারছ। তখন আর তাঁকে বাদ দিয়ে খাওয়া যায় কিছু? হয় আর এক প্লেট আনাতে হয় তাঁর জন্যে, নইলে আমাদের থেকেই ভাগ দিতে হয়। আর কী মন দিয়ে যে খান! পুডিংয়ের প্লেট দু-হাতে মুখের কাছে ধরে চাটতে থাকেন, কাটলেটের হাড়-ফাড় চিবিয়ে একেবারে পাউডার! দাড়িতে দৈবাৎ একটা পেঁয়াজ কুচো লেগে থাকলে সেটাকে খুঁজে বের করে—মুখে পুরে, তবে নিশ্চিন্তি!

আমরা বলি, 'পুণ্ডরীকবাবু, আপনি ভট্‌চায বামুন, খুব নিষ্ঠাবান, দু'বেলা গঙ্গাস্নান করেন, জামার তলায় রুদ্রাক্ষের মালাও রয়েছে। মুরগীর ডিম দেওয়া পুডিং খান কেন, মুরগীর হাড়ই বা চিবোন কী বলে?'

পুণ্ডরীকবাবু খুশী মনে দাড়ি মুছতে মুছতে বলেন, 'আপনিও তো বামুনের ছেলে, আপনি খান কেন?'

'আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করি না, গঙ্গাস্নানেও যাই না। কিন্তু আপনি এমন সাত্ত্বিক হয়েও—'

'আরে, অগস্ত্যের বংশধর না?'—হা-হা করে হাসেন পুণ্ডরীক-বাবু: 'অগস্ত্য মুনি কী করেছিলেন, মশাই? পুরাণের কথা মনে নেই? একটা গোটা অসুরকেই হজম করে ফেললেন। মুরগী তো তার কাছে তুচ্ছ জিনিস, মশাই!'

মোক্ষম যুক্তি যাকে বলে!

পুণ্ডরীকবাবুকে খাওয়াতে সুধীরের আপত্তি নেই, তার মনও ছোট নয়। কেউ যদি খেতে ভালোবাসে, তাকে খাইয়ে ভালোও লাগে। কিন্তু খাওয়ার লোভ জিনিসটাই বিশ্রী। পুণ্ডরীকবাবুর খাওয়া দেখলে, খাবারের দিকে তাঁর জ্বলজ্বলে চাউনি দেখলে, দু-হাতে তুলে প্লেট চাটতে দেখলে এমন জঘন্য লাগে যে কী বলব! কখনো কখনো দস্তুরমতো গা বমি-বমি করে।

লোকটি যে গরীব, খেতে পান না, তা তো নয়। তা হলে মায়া হতো। চাকরিটা ভালো করেন, ইন্‌শিয়োরেন্সের কাজ করে বেশ দু-পয়সা পান, বাদুড় বাগানে পৈতৃক বাড়ী—তার একতলা দোতলা থেকে শ-তিনেক টাকা অন্ততঃ ভাড়া পান, দমদমে একটা বড়ো বাগানও আছে। যে-কোনো সাধারণ গেরস্তর চাইতে ঢের বেশী বড়লোক তিনি। অথচ ওই স্বভাব—পরের পয়সায়

খেয়ে বেড়াবেন।

আবার ভণ্ডামিও আছে। প্রায়ই বলেন, 'একদিন সুধীরবাবু আর সুকুমারবাবুকে আমার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে গিন্নীর হাতের পোলাও, তপসে মাছের ফ্রাই, দই-ইলিশ আর মাংসের কোর্মা খাওয়াব। আমার গিন্নী এ-সব যা রাঁধেন, বুঝলেন—' বলতে বলতে সুরুৎ করে জিভের জল টেনে নেন একবার: 'খেলে জীবনে আর কোনোদিন ভুলতে পারবেন না।'

ভুলতে আমরা চাই না, কিন্তু খাওয়ার চান্স্ আর পাচ্ছি কোথায়! তিন বছর ধরে পোলাও-ফ্রাই-কোর্মার—গল্পই শোনাচ্ছেন কেবল, কিন্তু এক পেয়ালা চা পর্যন্ত কখনো খাওয়ালেন না!

আশ্চর্য এই যে, যেদিন খাবার নেই. সেদিন পুণ্ডরীকবাবুও নেই। শুধু চা এলে পুণ্ডরীকবাবু আসেন না। চা তিনি খান না, বলেন, ও-সব বিদেশী পানীয়, ব্রাহ্মণের খেতে নেই। তা ছাড়া চা খেলে খিদে নষ্ট হয়, জুত করে খাওয়া যায় না।

এইটেই আসল কথা। মুরগী খেলে ব্রাহ্মণের কিছু হয় না, আর ক'টা শুকনো পাতা একটু দুধ আর চিনি মিশিয়ে খেলেই ধর্ম-কর্ম গেল? কী লোক—দেখেছ!

আমাদের গোড়ার দিকে সমস্যা ছিল, কী করে টের পান পুণ্ডরীকবাবু! কোনো যোগবল-টল আছে নাকি ভদ্রলোকের? আমাদের জন্যে চপ-কাটলেট-কারী-ফ্রাই-পুডিংয়ের অর্ডার গেলেই মন্ত্রের জোরে টের পেয়ে যান, আর তৎক্ষণাৎ মুখভর্তি কাঁচা-পাকা দাড়ি আর জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে—হাওয়ায় উড়ে পৌঁছে যান দোতলার ঘরে: 'বাঃ, কী এল আজ? কবিরাজী কাটলেট? গন্ধেই মাত হয়ে গেছে, মশাই! বেড়ে তৈরি করে কিন্তু আপনাদের রসনারঞ্জন রেস্তোরাঁ!'

অতএব ভাগ দিতে হয়। চোখ বুজে মনের সুখে মুরগীর হাড় চিবুতে থাকেন পুণ্ডরীক, আর সুধীর আর আমি মনে মনে যা বলতে থাকি—

যা বলতে থাকি, সে আর তোমাদের শুনে কাজ নেই। মোটের উপর, সেটা পুণ্ডরীকের দীর্ঘ জীবন কামনা নয়—বলাই বাহুল্য !

অবশ্য—টের পান কী করে, একটু গোয়েন্দাগিরির সাহায্যে সেটা আবিষ্কার করেছি আমরা। রেস্তোরাঁর বাঁ দিকে রেডিয়ো-সারাইয়ের ছোট দোকান আছে একটা। রোজ বিকেলে সেখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকেন পুণ্ডরীকবাবু, দোকানদারের সঙ্গে অকারণ খোশগল্প করেন আর কড়া নজর রাখেন রেস্তোরাঁর দিকে। যেই খাবারের ট্রে তোয়ালে ঢাকা দিয়ে সুধীরের প্রেসের দিকে রওনা হলো, তৎক্ষণাৎ—

সুধীর বলে, 'লোকটা ছিনেজোঁক রে !'

আমি বলি, 'কী আর করবি ? ওঁর জন্যে একটা বাড়তি প্লেটের অর্ডার দিয়ে রাখিস, তা হলেই আর ঝামেলা থাকে না।'

সুধীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'আমার মনে হয় কী জানিস ? মরবার পরেও আমার সঙ্গ ছাড়বে না।'

আমি বলি, 'বোধহয় না। স্বর্গে গিয়ে তুই থালা নিয়ে বসেছিস, সঙ্গে সঙ্গে এসে বলবে, কী খাচ্ছ হে ? বেড়ে জিনিস তো !'

'তুই কী মনে করিস, অমন লোভী লোক কখনো স্বর্গে যাবে ?'

'না গেল ! নরক থেকেও দৌড়ে আসবে। স্বর্গের কোনো দারোয়ান ওকে ঠেকাতে পারবে না।'

স্বর্গে যাওয়া করুন আর নাই করুন, মর্ত্যে যে তাঁর হাত থেকে

কোথাও নিস্তার নেই, তার প্রমাণ পেতেও দেরি হলো না।

গরমের সময় দিন পনেরোর জন্যে দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়েছিল সুধীর। ফিরে এসেই পরের দিন সকালে সোজা আমার বাড়ীতে।

'কি রে, কেমন বেড়ালি? এই পনেরো দিনে ওজন-টোজন কিছু বাড়ল?'

'ধুত্তোর ওজন!'—সুধীর একেবারে খাঁচম্যাচ করে উঠল: 'এমন জানলে কে পয়সা নষ্ট করে যেত দার্জিলিঙে? সেই তুই যে বলেছিলি, মরলেও আমার নিস্তার নেই, নরক থেকে তেড়ে আসবে? ঠিক তাই।'

'তার মানে?''

'মানে বুঝিসনি? সেখানেও পুণ্ডরীক ভট্চায।'

'অ্যা!'

'হ্যাঁ। আদি আর অকৃত্রিম। সেই দাড়ি, সেই দাঁত, বাড়তির মধ্যে গলায় এক হলদে মাফলার, ভালুকের মতো একটা কোট আর একটা ধুসো চাদর।'

'বলিস কি! পুণ্ডরীকবাবুও বেড়াতে গিয়েছিলেন নাকি ওখানে?'

'খেপেছিস!'—নিমপাতা খাওয়ার মতো মুখ করল সুধীর: 'পয়সা খরচ করে বেড়াতে যাবে, সেই পাত্তর কি না পুণ্ডরীক ভট্চায! দার্জিলিঙে ওঁর এক মেয়ে-জামাই থাকে, তাদের ছেলের অন্নপ্রাশন, সেই জন্যে তারাই খরচ পাঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ওঁকে। বেশ পরস্মৈপদী বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া। আর নাতিকে বুড়ো অন্নপ্রাশনে কী দিয়েছে, জানিস? স্রেফ একখানা বর্ণ পরিচয়—ছ'আনা দামের।'

'তোকে কে বললে, এ-সব ?'

'নিজেই। বললে, অন্নপ্রাশনে সোনা-টোনা দেবার কোনো মানেই হয় না। বিদ্যের মতো অমূল্য রত্ন আর কিছু নেই—তার ওপরে আবার বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয়! এর চাইতে ভালো কী আর হতে পারে!'

আমি বললুম, 'ডেন্‌জারাস্‌!'

'ডেন্‌জারাস্‌ বলে ডেন্‌জারাস্‌! মরুক গে, বুড়ো তার নাতিকে যা খুশি দিক, আমার কিছু আসে যায় না তাতে। বুঝলি, রোজ সকালে হোটেলে আমার ঘরে যেই ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে, অমনি দাড়ি আর দাঁত নিয়ে এসে হাজির। আর ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বলে—রুটি-মাখন, ডবল-ডিমের ওমলেট, কলা, আবার মিষ্টিও দেয়! বাঃ—বাঃ। আমার মেয়ের বাড়ীতে সকালে রুটি-মাখন ছাড়া আর কিছুই হয়-টয় না। রুটিগুলো তো খুব ভালো দেখছি, আর কী গন্ধই বেরিয়েছে ওমলেটের—বেড়ে!'—সুধীর দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল: 'তারপরে তো বুঝতেই পারছিস!'

'বিলক্ষণ।'

'বিকেলে জলখাবার খেতে দেবে, তখনও এসে হাজির। ওটা কী খাচ্ছ হে, কাটলেট? আমার মেয়ের ওখানে এ-সব দেয়-টেয় না! তা কাটলেটটা খেতে খুব ভালো—তাই না? এখানকার মুরগীগুলো যা পুরুষ্টু!'—সুধীর আবার দাঁত কিড়মিড় করল: 'মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে করত পুণ্ডরীককে দিই একদিন পাহাড় থেকে ঠেলে নীচের ঝর্ণাটার ভেতরে। সে তো আর পারা যায় না, তাই কলকাতায় চলে এসেছি। নইলে আরো কিছুদিন থাকতুম রে। ভারী চমৎকার সীজন এখন ওখানে—বৃষ্টি নেই, রোজ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়।'

'তা হলে পুণ্ডরীকবাবু রয়ে গেলেন দার্জিলিঙে ?'

'সেই বান্দা !'—সুধীর বাঘাটে গলায় বললে, 'যেই শুনল্ আমি আসছি, সঙ্গে সঙ্গে বাক্স নিয়ে দার্জিলিঙ মেলে এসে উঠল। বললে, একসঙ্গে যাওয়া যাক। আর শিলিগুড়ি ইস্টিশনে বেশ করে আমার পয়সায়—'

'হুঁ !'

সুধীর একটু চুপ করে থেকে বললে, 'শোন্, এবারে নির্মম প্রতিশোধ নেব একটা।'

'কি রকম ?'—আমি বেশ উৎসাহ বোধ করলুম।

'তোকে এখন সবটা বলব না—' সুধীরের চোখ জ্বলতে লাগল : 'কাল সন্ধ্যেয় আসতে বলেছি পুণ্ডরীককে। লেটুস আর টোম্যাটো দিয়ে তৈরী ইতালীয়ান ওমলেট খাওয়াব বলে। তুইও অবশ্য আসবি।'

'লেটুস আর টোম্যাটোর ইতালীয়ান ওমলেট !'—আমি খাবি খেলুম : 'শুনিনি তো কখনো !'

'এবারে শুনবি।'—সুধীর উঠে দাঁড়াল : 'তা হলে কাল চলে আসিস আমার অফিসে। ঠিক ছ'টায়।'

গিয়ে দেখি, আমার আগেই আজ এসে গেছেন পুণ্ডরীকবাবু। আজকে আর তাঁর রেডিয়োর দোকানে ওত পেতে বসে থাকতে হয়নি—সুধীরই তাঁকে খেতে ডেকেছে। আনন্দে দাড়িসুদ্ধ চকচক করছে পুণ্ডরীকবাবুর।

আমাকে দেখেই এক গাল, মানে, এক দাড়ি হেসে বললেন, 'এই যে সুকুমারবাবু, ভালো আছেন ? বেশ আনন্দে ক'টা দিন

কাটানো গেল দার্জিলিঙে, সুধীরবাবুর সঙ্গে।'

সুধীর ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ করল কেবল।

পুণ্ডরীক আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকল রসনারঞ্জন রেস্তোরাঁর বেয়ারা। ব্যস, কথা বন্ধ—পুণ্ডরীক জুলজুল করে চেয়ে রইলেন ট্রের দিকে।

তিনটে প্লেটে তিনটে কোল-বালিশের মতো মোটা মোটা ওমলেট। কিন্তু তাদের রঙ ঘন সবুজ, তাতে লালের ছিটে। অমন ওমলেট আমি কখনো দেখিনি।

একটা নকশা-কাটা বাহারে প্লেট তুলে নিয়ে সুধীরই এগিয়ে দিলে পুণ্ডরীকের সামনে।

'কেমন সবুজ রঙ—' মুগ্ধ হয়ে বললেন পুণ্ডরীক।

'সেদ্ধ লেটুসের পাতা বেটে দিয়েছে কিনা, তাই।'

'আবার লাল লাল।'

'টোম্যাটোর কুচি।'

'তা হলে লেগে পড়া যাক—' বলেই চামচে দিয়ে খানিক কেটে মুখে পুরলেন পুণ্ডরীক। আমিও একটু খেলুম। লেটুস পাতা আর টোম্যাটো মেশানো আছে বটে। খেতে অদ্ভুত, কিন্তু খুব ভালো লাগল না।

পুণ্ডরীক একটু খেয়ে বললেন, 'ঝালটা যেন একটু—'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম: 'ঝাল আর কোথায়—' কিন্তু সুধীরের চোখের ইশারায় থেমে গেলুম। এদিকে পুণ্ডরীক বিদ্যুৎবেগে ওমলেটটা শেষ করলেন, আর করেই—তার চেয়েও দ্রুতবেগে উঠে দাঁড়ালেন।

'কী বলে ইতালীয়ান ইয়ে—উস্ উস্—খেতে ভালোই—উস্ উস্—তবে ঝালটা একটু—' বলতে বলতে যেন বাঘে তাড়া করেছে,

এইভাবে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে বললুম, 'ব্যাপার কি রে?'

সুধীর মুচকি হেসে বললে, 'বিশেষ কিছু না। ওই ফুল-কাটা প্লেটের ওমলেট যা ছিল, তা হলো স্রেফ পঞ্চাশ গ্রাম ধানী লঙ্কা বাটা।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, ওঁর জন্যে স্পেশ্যাল ব্যবস্থা করিয়েছিলুম। আরে তুই হাত গোটাচ্ছিস কেন? আমাদের এ দুটোয় লেটুস আর টোম্যাটো ছাড়া কিছু নেই। ওর ধানী লঙ্কার ওমলেটের সঙ্গে চেহারা মেলাবার জন্যেই তো এই প্রিপারেশ্যন করাতে হলো। খেয়ে দেখ্ না!'

আমি শিউরে উঠে বললুম, 'কিন্তু পঞ্চাশ গ্রাম ধানী লঙ্কা! ধাক্কা সামলাতে পারবেন?'

সুধীর বললে, 'সব পারবেন, অগস্ত্যের বংশধর না? দেখলি না, যা ঠোঁটে ছোঁয়ালে জিভ পর্যন্ত জ্বলে যায়, তার সবটা খেয়ে তবে বেরুলেন?'

'তাহলে খাইয়ে কী লাভ হলো?'

'দিনকতক তফাত থাকবেন। একটু জোলাপও মেশানো আছে কিনা।'

মোক্ষম দাওয়াই। দিন-চারেক আর পাত্তা নেই পুণ্ডরীক-বাবুর।

সেদিন গিয়ে দেখি, সুধীর বিষণ্ণ মুখে বসে।

'কী হলো রে?'

'ভারী অন্যায় হয়ে গেছে ভাই। লোকটা লোভী, তাই বলে অতটা করা ঠিক হয়নি রাগের মাথায়। ওর ছেলের মুখে

আজ রাস্তায় খবর পেলুম, পাঁচ দিন ধরে পেটের যন্ত্রণায় দাপাচ্ছে লোকটা। কিন্তু ডাক্তার ডাকেনি, পাছে পয়সা খরচ হয়।'

আমি বললুম, 'সে কী!'

সুধীর বললে, 'কী আর করা ভাই! আমিই ডাক্তার নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে এনেছি। ওষুধও কিনে দিলুম।'

এবারেও পুণ্ডরীকের জিত!

ওষুধ খাচ্ছেন, তা-ও পরের পয়সায়।

পিসেমশায়ের মামার গল্প



—জানিস, আমার পিসেমশাইয়ের মামা ছিলেন বনেদী জমিদার। চপচপে ঘি দিয়ে পোলাও খেতেন, আস্তো আস্তো পাঁঠা খেতেন, টগবগিয়ে ইয়া বড়া-বড়া অষ্ট্রেলিয়ান ঘোড়া হাঁকাতেন আর ভেলভেটে মোড়া মস্ত তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে নানারকম এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের কথা ভাবতেন।

—এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট? সাইন্টিষ্ট ছিলেন বুঝি?

—সাইন্টিষ্ট না হাতি! বনেদী জমিদার আবার লেখাপড়া করে নাকি? কোনোমতে খবরের কাগজটা পড়তে পারতেন—বিদ্যের দৌড় তো ঐ পর্যন্তই।

—লেখাপড়া জানতেন না তো এক্সপেরিমেন্ট করতেন কী করে?

—আরে সেইটেই তো তোকে বলছি। খবরদার, ডিষ্টার্ব করিসনি। কান পেতে শুনে যা।

পিসেমশাইয়ের মামা—মানে যার নাম ছিল নরসিংহবাবু, তাঁর পরীক্ষা চলতো নানা রকম চলতি কথা নিয়ে—যাকে বলে প্রবাদ। সেগুলোকে তিনি কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন।

যেমন, পিসেমশাইয়ের মামা—মানে নরসিংহবাবু শুনলেন, 'নেপোয় মারে দই।' তাঁর এক দূর-সম্পর্কের ভাইপো ছিল, নাম নেপাল, সবাই তাকে 'নেপো' বলে ডাকতো। নরসিংহবাবু ভাবলেন, নেপো যখন আছে, দইও যখন পাওয়া যায় বিস্তর—তখন একবার পরখ করেই দেখা যাক। কাজেই দুটো পেল্লায় হাঁড়ি ভর্তি প্রায় সের পাঁচেক দই এনে নেপোকে বললেন, 'খা। মানে সবটাই মেরে দিতে হবে তোকে।'

দইয়ের হাঁড়ি দেখেই তো নেপোর আত্মারাম খাঁচাছাড়া! সে কাঁউমাউ করে বললো, 'কাকা, এতোটা দই—'

নরসিংহবাবু সিংহনাদ করে বললেন, 'কোনো কথা শুনতে চাই না। শাস্তোরে যখন বলেছে, আর তোর নাম যখন নেপো, তখন ও দই তোকে মেরে দিতেই হবে। নইলে আমি তোকেই মেরে ফেলবো।'

তারপর নেপোর সেকি নিদারুণ দশা! দই খেতে খেতে পেট ফুলে গেল, চোখ কপালে ঠেলে উঠলো, দম বেরিয়ে যাওয়ার জো

হলো, তবু থামবার জো নেই। তারপর নেপো যখন গ্যাঁ-গ্যাঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেল, সিকি হাঁড়ি দই তখনো বাকি।

নরসিংহবাবু গোঁফে তা দিয়ে বললেন, 'যাক—পরীক্ষেটা সার্থক হলো।'

আর নেপো? গলা ভেঙে, সর্দিজ্বরে ভুগে, সে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার।

তাঁর আর এক ভাইপো ছিল, তার নাম নন্দ। বেশ মোটাসোটা গোলগাল ভালোমানুষ সে। একদিন—কথা নেই বার্তা নেই—নরসিংহবাবু নাপিত ডেকে নন্দর মাথাটা বিলকুল ন্যাড়া করে দিলেন।

ভয়ে নন্দ কথা বলতে পারলো না, শৌখিন টেরি ছিল তার মাথায়, কেবল টেরির দুঃখে সে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগলো।

নরসিংহবাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'চোপরাও—এক্ষুনি চলে যাও পুকুরের ধারে বেলগাছের তলায়। ন্যাড়া বেলতলায় যায় কিনা, সেটা আমি এবার দেখতে চাই।'

নন্দ আর কী করে? সেই চকচকে ন্যাড়া মাথায় চলে গেল বেলতলায়। আর বেলতলায় বসে ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ করে কাঁদতে লাগলো। কিন্তু বেশিক্ষণ কাঁদতেও হলো না—হঠাৎ ফটাস্—আর সঙ্গে সঙ্গেই ধপাস্!

—কে ফটাস্—কী ধপাস্?

—কে আবার ফটাস্—পাকা বেল। পড়লো নন্দর ন্যাড়া মাথায়। আর ধপাস্—মানে একটা চিৎকার ছেড়েই নন্দ চিৎ! বরাত জোরে মাথাটা ফাটলো না—একটা কমলালেবুর মতো ফুলে উঠলো চাঁদিটা। আর পিসেমশাইয়ের মামা বেশ করে গোঁফে চাড়া দিয়ে বললেন, 'যাক, এ পরীক্ষেটাও ভালোই হলো। বুঝতে

পারলুম—স্থাড়া কেন বেলতলায় যায় না।'

—কী ডেঞ্জারাস লোক রে!

—ডেঞ্জারাস বলে ডেঞ্জারাস! বাড়িসুদ্ধ লোক প্রায় পাগল হয়ে গেল। নরসিংহবাবুর এক্‌স্‌পেরিমেণ্টে ত্রাহি-ত্রাহি রব উঠলো চারদিকে। তারপর একদিন নিজেই টের পেয়ে গেলেন, কতো ধানে কতো চাল হয়। ধর্মের ঢাক বেজে উঠলো—ব্যস—ঠাণ্ডা।

—কী করে ঠাণ্ডা হলেন?

—বলি! সকলের ওপর পরীক্ষা-টরীক্ষা চালিয়ে একদিন তাঁর মনে হলো, একবার দেখতে হবে 'পরের হাতে তামাক খেতে' কেমন লাগে। অর্থাৎ তিনি তামাক খাবেন, আর অন্যলোক তাঁর মুখের কাছে হুঁকো ধরে থাকবে।—তা এ আর শক্তটা কী? বাড়িতে তো ডজন দুই চাকর। তাদের তিনটেকে তিনি এই কাজে লাগিয়ে দিলেন। তারা তামাক সেজে আনে আর পিসেমশাইয়ের মামা বুরুর-বুরুর করে সেই তামাক টানেন। দেখলেন, পরের হাতে তামাক খাওয়াটা ভারি সুখের ব্যাপার, হাতে করে হুঁকো ধরবার কষ্টটুকুও সইতে হয় না—যেদিকে মুখ ঘোরান সেদিকেই হুঁকো, এমনকি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটেন—তখনো তৈরি হুঁকো তাঁর মুখের সামনে যেন নাচতে থাকে।

তামাক খাওয়ার এই নতুন কায়দাটা শিখে নরসিংহবাবুর আনন্দের আর সীমা রইলো না। একদিন দুপুরে ভেলভেটে মোড়া তাকিয়া ঠেসান দিয়ে অমনিভাবে তামাক খাচ্ছেন, আর একটা নতুন কোনো এক্‌স্‌পেরিমেণ্টের প্ল্যান আঁটছেন, সেই সঙ্গে ঝিমোচ্ছেন অল্প অল্প, ঠিক তখন—

তখন কোত্থেকে এক ডেঁয়ো পিঁপড়ে—বিশেষ কিছু করলো

না, কেবল যে চাকরটা মুখের কাছে হুঁকো ধরে বসে ছিল, তার পায়ের আঙুলে বসিয়ে দিলো এক মোক্ষম কামড়।

'বাপ্‌রে' বলে চাকরটা মারলো রাম লাফ। হুঁকো থেকেও লাফিয়ে বেরুলো কল্কেটা, আর তার সবটা জ্বলন্ত তামাক, সব ক'টা গনগনে টিকে সোজা উল্টে পড়লো নরসিংহবাবুর টাকে!

'গেছি—গেছি—জ্বলে মরলুম—উরে ব্বাপস—' বলে নরসিংহ বাবু খ্যাঁকশেয়ালের মতো দাপাদাপি করতে লাগলেন—চিৎকারে সাতপাড়া এক হয়ে গেল। আর পিসেমশাইয়ের মামার সেইটেই হলো শেষ এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। কারণ, সেদিনই তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝে গেলেন—'ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে' এই বচনটার মানে কী।

কবিতার জন্ম



বল্টুদা আমাকে বললে, শুক্তিগাছার নাম শুনেছিস কখনো ?

আমি বললুম, না।

বল্টুদা খুব উদাসমতন হয়ে, আকাশের দিকে চোখ তুলে, কবির মতন বললে, সে এক আশ্চর্য জায়গা। সেখানে পুকুরভরা কোকিল-দোয়েল-পাপিয়া, গাছভরা রুই-কাতলা-চিংড়ি—

আমি চমকে বললুম, কী বললে ?

—ও হো, ভুল হয়েছে। মানে, সেখানে গাছভরা কোকিল-দোয়েল—

বল্টুদা সেই আধঘন্টা ধরে কী রকম কবি-কবি মুখ করছে, কাক-টাক দেখলেই কেন যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে—আমার ভারী বিরক্তি ধরে গেল। আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা একবার কবি হয়ে ধোপার খাতায় পদ্য লিখেছিল আর পিসেমশাই তার কান পাকড়ে ধরে ডন-বৈঠক করিয়েছিলেন। সেই দুঃখে ফুচুদা আর কিছুতেই আই-এ পাস করতে পারল না। আর তারপর থেকে কারুর কবি-কবি মুখ দেখলেই ভারী বিচ্ছিরি লাগে আমার।

আমি উঠে পড়লুম। বল্টুদা বললে, কোথায় যাচ্ছিস ?

—চাটুজ্জেদের রোয়াকে। ওখানে টেনিদা আছে, হাবুল আছে—

টেনিদার নাম শুনেই বল্টুদা চটে গেল। বললে, ওই জুটেছে তোদের এক মুরুব্বী—ওই টেনি! বাজে গপ্পের ডিপো, খালি গাঁ-গাঁ করে চ্যাঁচাতে পারে। ওর চ্যালাগিরি না করলে বুঝি পেটের ভাত হজম হয় না ? আমার কাছে একটু বসলে আমি কি তোকে কামড়ে দেবো ?

আমি বললুম, তুমি যে কবি হয়ে যাচ্ছ। কাউকে কবি হতে দেখলেই আমার ভয় করে।

বল্টুদা বললে, কেন ভয় করে ? কবিরা কি মানুষ খায় ? বাজে বকিসনি প্যালা। কবিতা যে কখনো কখনো কী মহৎ কাজে লাগে, সেইটে বোঝাবার জন্যেই তো তোকে আমি শুক্তিগাছার কথা বলছিলুম। কিন্তু তুই সমানে ছটফট করছিস। গল্পটা শুনতে চাস তো চুপ করে বসে থাক ওখানে।

গল্প শুনতে কে আর না চায় ? আমি নিমগাছটার তলায়

বল্টুদার পাশেই বসে পড়লুম। বেশ মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছিল আর টুপটুপ করে পড়ছিল পাকা নিমের ফল। ফলগুলো দিব্যি পাকা আঙুরের মতো দেখতে। কিন্তু মুখে দিলেই—ওঃ! কী বিটকেল স্বাদ আর কী যাচ্ছেতাই গন্ধ!

বল্টুদা বললে, শুক্তিগাছা—মানে, সে এক অদ্ভুত জায়গা। সেখানে নদী কুলুকুলু করে গান গায়, সেখানে পাহাড় থেকে ঝরনা-টরনা নামে, সেখানে চাঁদিনী-টাদিনী যেন কী সব হয়, দোয়েল-শ্যামা-বুলবুলি—এরা তো আছেই। কিন্তু হলে কী হয়ে, শুক্তিগাছার মেসোমশাই কবিতার নাম শুনলেই আগুন হয়ে যান। তিনি বলেন, কবিরা মনিষ্যি নয়, তাদের মাথা খারাপ, লোকগুলোকে ধরে ধরে খাঁচায় রেখে দেওয়া উচিত। ইস্কুলে কবিতার পড়া থাকলেও বাড়িতে কেউ তা চেঁচিয়ে পড়তে সাহস পেতো না। যদি মিহি সুরেও কারো গলা দিয়ে বেরিয়েছে: 'কোন্ দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল', সঙ্গে সঙ্গে মেসোমশাই তাকে 'ঘোড়া—ঘোড়া ঘাস-ঘাস'-এর ত্রৈরাশিক অঙ্ক দিয়ে বসিয়ে দিয়েছেন।

বললে বিশ্বাস করবিনে প্যালা, সেই মেসোমশাইয়ের ছোট ছেলে পোকন কবি হয়ে গেল। কী করে যে হলো, সেও এক তাজ্জব ব্যাপার। ছেলেবেলা থেকেই দাঁতে পোকা বলে ওর ঠাকুমা ওই নাম দিয়েছিল ওকে। প্রায়ই ওর পোকা-খাওয়া দাঁতে যন্ত্রণা শুরু হতো, আর অমনি কাঁউমাউ শব্দে চ্যাঁচাতে শুরু করত পোকন। একদিন তা থেকেই—

বল্টুদা একটু থামল: হ্যাঁরে প্যালা, কী যেন ব্যথা-ট্যথা থেকেই প্রথম কবিতা গজিয়েছিল না? মানে ক্রৌঞ্চ নামে একজন ব্যাধ, বাল্মীকি নামে একটা পাখিকে—

আমি বললুম: ছ্যাৎ, যা-তা বলছে!

—অ, তাহলে বোধহয় বাল্মীকি বলে একজন ক্রৌঞ্চ, নিষাদ বলে কাকে মেরে ফেলেছিল—

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম,. কী আবোলতাবোল বকছ বল্টুদা! মহাকবি বাল্মীকির কবিত্বলাভ কী করে হলো, তাও তুমি ভুলে গেলে?

—থাম্, তোকে আর শেখাতে হবে না। মানে—খুব একটা কান্নাকাটির ব্যাপার থেকে কবিতা জন্মেছিল—এই তো? পোকনেরও তাই হলো। দাঁতের ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ বলে বসল:

হায় মোর একি দন্তশূল
যেন শত বোল্তার হুল
প্রাণ মোর করিল নির্মূল—
বুঝিলাম বিধি প্রতিকূল।

মাসীমা পোকা-খাওয়া দাঁতের গোড়ায় কী যেন একটা পেণ্ট করে দিচ্ছিলেন। পোকনের কবিতা শুনে তিনি তো চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন: দাঁতের ব্যথায় পোকন বুঝি পাগল হয়ে গেল!

শুনে পোকন বললে:

পাগল? কে কয় মোরে?
অতিশয় যাতনার ঘোরে
সরস্বতী নামিলেন মগজে আমার
ডেকেছে কাব্যের বান, বিশ্ব এবে হবে তোলপাড়।

তারপর কী যে হলো সে তো বুঝতেই পারছিস। প্রথমটা মেসোমশাই ভেবেছিলেন, পোকন বুঝি মায়ের সঙ্গে ফাজলেমি করছে। তিনি এসেই পোকনের কান বরাবর এক রামচাঁটি তুললেন। তাতে পোকন বলে বসল:

মেরো না মেরো না পিতা মোর গালে চড়,
কাব্যদেবী কাঁদিবেন করে ধড়ফড়।

শুনে মেসোমশাই হাঁ করে রইলেন কিছুক্ষণ। এ তো ঠিক ইয়ারকির মতো শোনাচ্ছে না। গড়গড়িয়ে কবিতা বলে যাচ্ছে, তাতে ছন্দ আছে, মিলও আছে যে! কী সর্বনাশ!

নির্ঘাত ভূতেই ধরেছে। আর ভূতে পেলে কে না জানে—মানুষের অসাধ্য আর কিছু থাকে না, এমন কি অখাদ্যও না! রোজার জুতো-টুতো পর্যন্ত মুখে নিয়ে নাকি হামাগুড়ি দেয়।

কাজেই ডাকো রোজা। লাগাও ঝাড়ফুঁক।

ঝাঁটা-সরষে এসব নিয়ে রোজা এসে হাজির। তাকে দেখেই পোকন বলে উঠল:

কাহারে মারিবে ঝাঁটা তুমি ভাই, সরিষা মারিবে কারে?
ভূত নয় ভাই, সরস্বতী-যে চেপেছেন মোর ঘাড়ে।
ঝাঁটা নিয়ে তুমি চলে যাও সখা, সরিষা বাটিয়া খাও,
ওঝাগিরি আর ফলিয়ো না হেথা, আমারে রেহাই দাও!

রোজার হাত থেকে ঝাঁটা-ফাঁটা সব পড়ে গেল। তার মুখের চেহারা দেখে মনে হলো, এক্ষুনি সে কেঁদে ফেলবে। তারপর ঢুম করে পোকনকে একটা পেন্নাম করলে, আর হাতজোড় করে মেসোমশাইকে বললে—আমাকে রেহাই দিন মশাই, এ আমার কম্ম নয়, ভূত-পেতনী নয়, আরো জবর কিছু চড়াও হয়েছেন এনার ওপর। কোনো রোজার সাধ্যি নেই তাকে নড়ায়। সরষে কেনার চার গণ্ডা পয়সা আমাকে দিয়ে দিন, আমি সরে পড়ি।

শুনে আমি বললুম, তাহলে সরস্বতীই ওর ঘাড়ে চাপলেন?

বল্টুদা বললে, বয়ে গেছে সরস্বতীর, তাঁর তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই! আরে, মা সরস্বতী এলে কি আর এসব যা-তা কবিতা

বেরুত ? তাহলে তো কালিদাসের মেঘদূত বধ আর মাইকেলের কী বলে--কী বই লিখেছিলেন রে মাইকেল ? গীতাঞ্জলি না ব্যাকরণ কৌমুদী ?

—তোমার মুণ্ডু !

অন্যমনস্কভাবে একটা নিমফল তুলে নিয়ে চিবিয়ে ফেলল বল্টুদা। একবার চিবুতেই মুখটাকে কী রকম খাস্তা কচুরির মতো করে, থু-থু করে সেটা ফেলে দিলে। বললে, মরুক গে, সরস্বতী দয়া করলে ও একটা মেঘনাদ-কৌমুদী কিংবা গীতাঞ্জলি-বধ-টধ কিছু লিখত। তা নয়, সমানে এইসব আবোলতাবোল ছড়া কাটতে লাগল। এই মনে কর্—মাসীমা বঁটি পেতে বসে ওল কাটছেন, পোকন অমনি বলে উঠল ঃ

জননী গো, কাটিয়ো না ওল,
হাত যদি করে চিড়বিড়
প্রাণ তব হইবে অস্থির
লেগে যাবে ঘোর গণ্ডগোল।

শেষ পর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিলে। যদি নিতান্তই কবি হওয়া পোকনের কপালে থাকে, তাহলে খণ্ডাবে কে ! তাও আবার সব সময় কবিত্ব ওর মগজে চাগিয়ে উঠত না। দাঁতের ব্যথা শুরু হলেই পোকন আর কান্নাকাটি করে না—তার বদলে কবিতা ছুটতে থাকে ওর মুখ দিয়ে ঃ

আজ যে হইল কবিতার বেগ—হবে তাহা দুর্দমনীয় !

দাঁতের ব্যথা যখন নেই, তখন কিন্তু পোকন বেশ আছে। তোর আমার মতো খাচ্ছে-দাচ্ছে-কাঁসি বাজাচ্ছে, পড়া না পেরে ক্লাসে নীল-ডাউন হচ্ছে, ফুটবল খেলতে গিয়ে গোবরে আছাড় খাচ্ছে—মানে, একদম স্বাভাবিক। কিন্তু যেই একবার দাঁতে কনকনানি

আরম্ভ হলো, অমনি হা-রে-রে-রে করে ছুটে বেরুল ওর কবিতা। একেবারে দুর্দমনীয় !

সবাই জিজ্ঞেস করত : দাঁতের ব্যথা হলে তুই কবিতা বানাস কী করে ?

পোকন বলত : আমি জানি না। কেমন যেন পেটের ভেতর থেকে আপনিই ঝাঁপ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

—দাঁতের ব্যথা নিয়ে বকবক করতে তোর ভালো লাগে ?

—ভালোমন্দ জানি না। কবিতা না আউড়ে আমি থাকতেই পারি না।

এমনি চলছিল, হয়তো পোকন বড়ো হয়ে দুর্দান্ত কবি হতো। দন্তশূল আরো আরো বাড়ত, আর তার ঠেলায় কী বলে ওই যে, নভেল প্রাইজ না উপন্যাস প্রাইজ কী একটা আছে, টপাস করে সেটাও পেয়ে যেতে পারত একদিন। সব হতো, যদি না একদিন ছোটমামা শুক্তিগাছায় আসতেন।

আমার ছোটমামা মানে পোকনেরও ছোটমামা—মানে মাসীমা তো আমারই মায়ের বোন কিনা ! ছোটমামা আবার কড়া লোক, তায় দাঁতের ডাক্তার। এদিকে তো ছোটমামাকে আসতে দেখে পোকন বেশ হাসি-হাসি মুখে সামনে এসেছে, হয়ত ভেবেছে নিশ্চয় ভালো খাবার-দাবার আছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু পোকনের সেই হাসি-হাসি দাঁতের দিকে একবার তাকিয়েই ছোটমামা আর্তনাদ করে উঠলেন : হরিবোল—হরিবোল !

আমি বললুম, হরিবোল কেন ? বোধ হয় হরিবল্ ? মানে—কী ভয়ানক ?

বল্টুদা বললে, তা হতে পারে। তবে পোকাধরা সে-সব নীলচে নীলচে কালো কালো নোংরা দাঁত দেখলে শুধু হরি নয়,

কালী-দুর্গা-ছিন্নমস্তা-বাবা বৈদ্যনাথ, সক্কলকে মনে পড়ে যায়। তারপর ছোটমামা কী করলেন, জানিস? বাক্সে সব যন্তর-টন্তর তাঁর ছিলই, পোকনকে সন্দেশ খাওয়ানো দূরে থাক, পরদিনই তাকে একটা টেবিলের ওপর চিত করে ফেলে কটাংকটাং করে তিনটে পোকা-দাঁত উপড়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, তারপর?

তারপর আর কী? সর্বনাশ হয়ে গেল পোকনের। দাঁতও গেল, কবিত্বও গেল। দাঁতে আর ব্যথা হয় না, কবিতাও আর গজগজিয়ে বেরিয়ে আসে না। এমন কি মাসীমা যখন সামনে বঁটি ফেলে কচাকচ করে চালকুমড়ো, মানকচু কিংবা পালং শাক কাটতে থাকেন, তখনো পোকন চুপ। এতদিন যে ঝিঁঝিপোকার মতন ঝিঁ-ঝিঁ করত, সে এখন শুঁয়োপোকার মতো নীরব।

মেসোমশাই যে কী খুশী হলেন প্যালা, সে আর তোকে কী বলব। ছোটমামাকে, মানে নিজের ছোট শালাকে -খুব ভালো একটা স্যুট্ বানিয়ে দিলেন। আর বাড়িতে তিন দিন ঘটা করে হরির লুট হলো। তোকে তো আগেই বলেছি, কবিতার ওপরে হাড়ে হাড়ে চটা ছিলেন মেসোমশাই।

কিন্তু জানিস তো, ভগবান আছেন। আর ভগবানই বা বলব কেন, সেই যে যিনি পোকনের ঘাড়ে চড়াও হয়েছিলেন আর ছোটমামার পাল্লায় পড়ে নেমে গেলেন? তিনিও তো ছিলেনই।

তার ফলে এই হলো যে, মাসখানেক বাদে একদিন ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যেতে যেতে উলটে পড়লেন মেসোমশাই। আর কোথাও কিছু হলো না, কিন্তু দারুণ রকমের চোট পেলেন ডান দিকের হাঁটুতে। কোমরেও খুব লাগল।

হাঁটু ভাঙল-টাঙল না, কোমরের ব্যথাও সারল, কিন্তু কিছুদিন

যেতে না যেতেই বাত দেখা দিল হাঁটুতে আর কোমরে। জানিস তো—বাতের সঙ্গে কোনো চালাকির বাত্ চলে না—মেসোমশাইয়ের মতো ভুঁদে লোকও জব্দ হয়ে গেলেন।

বাতের ব্যথা উঠলে আরো দশজন সাধারণ মানুষের মতো তিনি নিয়মমাফিক 'উঃ আঃ কুঁই কাঁই' করতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন কী যে হলো, ঘর কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি ঃ

একি হেরি অকস্মাৎ
বিনামেঘে বজ্রাঘাত,
ঘোড়া হতে চিতপাত
কোমরে গজালো বাত
আমারে করিল কাত
আছি খিঁচাইয়া দাঁত—

ব্যস্—শুরু হলো মেসোমশাইয়ের কাব্যচর্চা। দাঁত তোলবার পরে পোকন তো ভালো মানুষের মতো অঙ্ক-টঙ্ক কষতে লাগল, কবিতার ধার দিয়েও আর যায় না, কিন্তু জানিস তো, বাত একবার হলে আর ছাড়ে না ? চান্স পেয়ে মেসোমশাই সত্যি সত্যিই কবি হয়ে গেলেন। মানে পোকনের মতো লাউ-কুমড়ো-কচু নিয়ে মুখে মুখে পদ্য না বানিয়ে খাতায় কাগজে লিখতে লাগলেন। সেই যে কালিদাস মেঘদূতকে বধ করায় 'বাল্মীকি বাল্মীকি' বলে কাঁদতে কাঁদতে নিষাদ যেমন করে পদ্য বানিয়েছিল, তেমনি করে বাতের চোটে কাত হয়ে মেসোমশাই কবিতা লিখে দিস্তে দিস্তে কাগজ ভরে ফেললেন।

কবিতা লিখলেই ছাপতে হয়। মেসোমশাইও একটা বই ছেপে ফেললেন, নাম দিলেন "এ যে মোর ব্যথার কাকলী"। আর বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে লোকে কী ভীষণ ভালো বলতে লাগল!

ক্রিটিকেরা সবাই বললে, "রামচরণবাবু সত্যিকারের কবি! যথার্থ বেদনা বোধ করিলেই এইরূপ মহৎ কাব্য লেখা যায়।"

আরে, যথার্থ বেদনা না তো কী! বাতের ব্যথার সঙ্গে চালাকি! যখন ওঠে, তখন টের পাইয়ে দেয় কত ধানে কত চাল হয়।

পোকন তো "নভেল-প্রাইজ" পেলো না, কিন্তু শোনা যাচ্ছে শিগগিরই মেসোমশাই দিল্লী-টিল্লী থেকে কী যেন পুরস্কার পাবেন। তাই আর একখানা বই ছাপা হচ্ছে তাঁর—তার নাম "বাতায়ন"। মানে, জানলা-টানলার কারবার নয়, বাতের ব্যথা থেকে লেখা বলেই বাতায়ন।

সেইজন্যে বলছিলুম প্যালা, ব্যথা থেকেই কবিতার জন্ম হয়। আর কবিতা কী যে মহৎ জিনিস--

বলতে বলতেই একটা নিমফল কুড়িয়ে নিয়ে চিবিয়ে ফেলল বল্টুদা, আর থু থু করে ফেলে দিলে সেটাকে। বিচ্ছিরি স্বাদে গন্ধে তার মুখখানা ঠিক মোচাঘণ্টের মতো হয়ে গেল।

আমি নিমগাছতলা থেকে উঠে পড়লুম। যাওয়ার সময় উপদেশ দিয়ে বলে গেলুম, বসে বসে আরো নিমের ফল চিবোও গোটাকয়েক, তোমারও মুখ দিয়ে গড়গড়িয়ে কবিতা বেরুতে থাকবে।

তিন আনার আমের জন্য



আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি আর হারুবাবু ঝোলা-লাগানো আঁকশি দিয়ে একটার পর একটা পাকা আম পাড়ছেন। খাসা আমগুলো! এত দূরে দাঁড়িয়েও আমের গন্ধে আমার প্রাণমন উদাস হয়ে যাচ্ছে।

আর একটা সোনালি রঙের আমকে ঝুড়িতে সাজিয়ে রেখে হারুবাবু বললেন—কি হে প্যালারাম, অমন জুলজুল করে তাকিয়ে

দেখছ কী—অ্যাঁ ?

আমি বললুম—কিছু না।

—কিছু না ?—হারুবাবু এমন হেঁ হেঁ করে হাসলেন যে আমার পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল : মিথ্যে নজর দিয়ে কষ্ট পাচ্ছ কেন, শুনি ? এ আমগুলো বাজারে পাঠাব—টাকায় ছ'টা করে বিক্রী হবে।

—হোক্ না বিক্রী—আমার কী ?—আমি ব্যাজার হয়ে জবাব দিলুম।

—তোমার কী ? তা বটে। বেল পাকলে কাকের কিছু আসে যায় না বটে !—হারুবাবুর মুখে আবার সেই গা-জ্বালানো হাসি।

আমার অপমান হলো। হাঁড়ির মতো মুখ করে বললুম, ও আম আমি খাই না।

—পেলে তো খাবে ? যাও—যাও—মিথ্যে এখেনে দাঁড়িয়ে থেকে আর কষ্ট পেয়ো না।—বলে আবার আঁকশি দিয়ে আর একটা পাকা আম নামাতে লাগলেন।

আমি গেলুম না। বাগান হারুবাবুর বটে, কিন্তু রাস্তাটা তো মিউনিসিপ্যালিটির। সুতরাং আমি যতক্ষণ ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকব, যত খুশি নজর দেবো। হারুবাবু বললেই যাচ্ছি আর কি ! যেতে বয়ে গেছে আমার !

বিচ্ছিরি কিপ্‌টে এই লোক্‌টা ! টাকার আণ্ডিল—অথচ প্রাণে ধরে একটা পয়সা খরচ করবে না। আমাদের এই শহরের ভিখিরীরা পর্যন্ত ওঁর দোরগোড়ায় যায় না—পাছে ঝুলি ফেঁসে যায়। সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে গেলে বেরিয়ে আসে স্রেফ দুটো নয়া পয়সা। তা হলেই বোঝো।

হারুবাবু আমাকে আম খেতে দেবেন এ আশা আমার

কোনদিনই ছিল না। কিন্তু এমন খাসা টুকটুকে আম—গন্ধে চারদিক ম-ম করছে, প্রাণ ভরে দেখতে দোষটা কী! আমিও তাই দেখছিলুম আর মনে মনে ভাবছিলুম, একটা নীরেট কাঁচা আম যদি অনেক উঁচু থেকে টপাক করে ওঁর টাকের ওপর পড়ে—বেশ হয় তা হলে!

এক-একটা করে পাকা আম হারুবাবুর আঁকশির ঝোলায় নামছে, আমি হাঁ করে দেখছি—ঠিক তখন—

রামছাগলটা কখন গুটি গুটি পায়ে ঝোপের আড়াল থেকে এগোচ্ছিল আমরা কেউই দেখতে পাইনি। কিংবা ছাগলের গতিবিধি কে-ই বা দেখতে পায়। ছোট ছোট চারটে পা, এক গাল দাড়ি আর দু'ইঞ্চি একটা ল্যাজ নিয়ে চিরকাল ওরা আমার কাছে এক দারুণ রহস্য। ওরা পৃথিবীর সব জিনিস খেয়ে থাকে, কিন্তু বাঘ ধরে খেতে পারে না কেন এবং বাঘেই বা পাল্টা ওদের ধরে খায় কেন—এ সমস্যার সমাধান আমি কখনো করতে পারিনি।

হঠাৎ হারুবাবুর হায় হায় চিৎকারে আমার চমক ভাঙল।

—ধরো ধরো প্যালারাম—নিলে—আম নিয়ে গেল—তিন আনার আম নিয়ে গেল একটা—

তাকিয়ে দেখি সেই চির রহস্যময় ছাগল। একটা আম গালে পুরে সে ছুটছে, তার মিহি দাড়ি ফুরফুর করে উড়ছে হাওয়ায়, দু'ইঞ্চি ল্যাজটা রেলের টিকিটের মতো উঁচু করে মেল ট্রেনের মতোই সে ধাবমান।

—ধরো প্যালারাম—তারস্বরে ডাকলেন হারুবাবু! ছুটতে ছুটতে আমায় বললেন—ধরতে পারলে কেটে খাব ব্যাটাকে—তোমাকেও ভাগ দেবো।

এটা ভালো প্রস্তাব। আমারও উৎসাহ এসে গেল।

কিন্তু ছুটন্ত ছাগলকে—বিশেষ করে রামছাগলকে কে ধরতে পারে উড়ন্ত পাগল ছাড়া? আর পাগল কখনো উড়তে পারে কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। কারণ কোনো উড়ন্ত পাগল আমি কোনোদিন দেখিনি।

অতএব আধ মাইলখানেক ছোটবার পরে ছাগল যখন দিগন্তে বিলীন হলো, তখন পেছন ফিরে হারুবাবু আবার হাহাকার করে উঠলেন।

—গেল গেল প্যালারাম—সর্বস্ব গেল আমার।

—কেন গেল, কোথায় গেল, কবে গেল?—ছাগল ধরবার আশায়, মাংসের লোভে আমি তখনো ছুটছি—হাঁপাতে হাঁপাতেই জানতে চাইলুম: কোন্ ট্রেনেই বা গেল?

—ধুত্তোরি!—হারুবাবু আমার ঘাড় চেপে ধরলেন: চুলোয় যাক তোমার ট্রেন! ফেরো—ফেরো! গোরু—গোরু এসে পড়েছে!

—কোত্থেকে পড়ল?

—তোমার মুণ্ডু থেকে।—হারুবাবু আমাকে টানতে টানতে আবার বাগানের দিকে ছুটলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন: পালা—পালা—হেট্ হেট্! গেল প্যালারাম—আমার সব গেল!

তখন আমি দেখতে পেলুম। আমরা যখন ছাগলের পেছনে ছুটেছি, সেই সময় গোরু এসে পড়েছে আমের গন্ধে। আর নিশ্চিন্তে ল্যাজ দিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে সোজা এগোচ্ছে হারুবাবুর ঝুড়ির দিকে।

হারুবাবু আবার গগনভেদী চিৎকার করলেন: হেট্ হেট্—পালা—পালা—

অতদূরের হাঁকে গোরুর কিছুমাত্র বিকার দেখা গেল না।

পরিষ্কার দেখতে পেলুম আমের ঝুড়ির ওপর তার মুখখানা গভীর মনোযোগের সঙ্গে নেমে গেল।

হারুবাবু একটা খাবি খেলেন।

—এক গ্রাসেই তো তিনটে খেয়ে নেবে—অ্যাঁ! হেট্—হেট্—ভাগ—বলেই মাটি থেকে কী কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিতে চাইলেন গোরুর দিকে। কিন্তু সেটা গোরুরই খানিকটা গোবর—ঘাস হারামি করতে রাজী হলো না। উল্‌টে হারুবাবুরই হাতে-টাতে লেগে গেল।

—উঃ—কী গন্ধ! ধরো প্যালারাম—ধরো। ওই—ওই আবার খাচ্ছে! ওফ্—আরো তিনটে! পুরো এক টাকার আম খেয়ে নিলে যে!—হারুবাবু ডুকরে উঠলেন।

আমরা এসে পড়েছি দেখে গোরুও ছুট লাগালো।

—ধরো, গোরু ধরো—প্যালারাম—কুইক্!

—গোরু ধরে কী হবে?—আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: ওরও মাংস খাবেন নাকি?

—ওয়াক থু—রাম রাম! হিঁদুর ছেলে না আমি?—গোরুকে তাড়া করতে করতে হারুবাবু বললেন—খোঁয়াড়ে দেবো ওটাকে—খোঁয়াড়ে। অন্তত: আটগণ্ডা পয়সা উসুল হবে। তা থেকে দু'আনা তোমাকেও দেবো। ছোটো—ছোটো—

দু'আনা! তাই বা মন্দ কী। খামোকা দু'আনা পয়সাই বা আমায় দিতে যাচ্ছে কে! আবার গোরুর পেছনে ছুট লাগালুম দু'জনে!

কিন্তু ছুটন্ত ছাগলকে যদি উড়ন্ত পাগল ছাড়া কেউ ধরতে না পারে, তবে দৌড়বাজ গোরুকে কে ধরতে পারে ধড়িবাজ গৌয়ারগোবিন্দ ছাড়া? ছাগল ছুটেছিল মেল ট্রেনের মতো, গোরু

ছুটল জেট্ প্লেনের মতো। পেছনের ল্যাজটা তার জয়ধ্বজার মতো উড়তে লাগল।

—ধর্—ধর্—ধর্—

ধরা গেল না। গোরুকে ধরে খোঁয়াড়ে দেবে—গোঁয়ার ছাড়া এমন গোঁ আর কার আছে?

অগত্যা গোঁ গোঁ করতে করতে ফিরে এলেন হারুবাবু। দু'আনার আশা ছেড়ে আমাকেও ফিরতে হলো। গোরুতে ক'টা আম খেয়েছে কে জানে। ঝুড়ির অনেকখানিই সাফ!

হারুবাবু সোজা চোখ বুজে আমগাছতলায় শুয়ে পড়লেন।

—গেল প্যালারাম, কম্‌সে কম দু'টাকার আম আমার গেল।

কী আর করি! একটা ডাল কুড়িয়ে হারুবাবুর মাথায় হাওয়া দিতে লাগলুম!

আরো একটা জিনিস আমি দেখেছি। একটা কুকুর হারুবাবুর একপাটি নতুন চটি নিয়ে পালিয়েছে।

কিন্তু কুকুর ধরে লাভ কি! তার মাংস খাওয়া যায় না—তাকে খোঁয়াড়েও দেওয়া যায় না বোধ হয়। আর পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত জুতো নিয়ে পলাতক কুকুরকে কে-ই বা ধরতে পেরেছে? কোনো উড়ন্ত পাগলও নয়—কোনো ধড়িবাজ গোঁয়ারগোবিন্দও নয়!

তা ছাড়া শক্‌টা একটু সামলে নিন হারুবাবু। এই মুহূর্তেই দুঃসংবাদটা দিয়ে ওঁর অপঘাত ঘটিয়ে কী হবে?

শয়তানের সাঁকো



একদিকে একটি ভারী সুন্দর শহর, আর একদিকে গ্রাম, মাঠ, বন-জঙ্গল। সব মিলে চমৎকার। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, শহরের লোক গাঁয়ে আসতে পারে না—গাঁয়ের লোকের শহরে

যাওয়ার জো নেই। মাঝখানে একটা দারুণ বাধা।

কিসের বাধা? মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে দুর্দান্ত এক পাহাড়ে নদী। এমন কিছু চওড়া তা নয়, কিন্তু যেমন সে গভীর, তেমনি প্রবল তার স্রোত। জায়গাটা হচ্ছে সুইট্জারল্যাণ্ড্। একদম পাহাড়ের দেশ—পাথরে পাথরে ঘা দিয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে ঝড়ের বেগে বয়ে চলেছে নদী। তার গর্জন শুনলে কানে তালা ধরে যায়, কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থাকলে মাথা ঘুরতে থাকে।

সমস্যা হচ্ছে, এই নদীর ওপরে একটা পুল বাঁধা যায় কী করে।

চেষ্টা যে হয়নি, তা নয়। অনেক পরিশ্রম, অনেক খরচ করে, ঢের মাথা খাটিয়ে একটা সাঁকো হয়তো তৈরি করা হলো। একদিন রইল, দু' দিন রইল, তারপরেই—ব্যস্! কোত্থেকে নেমে এল ভয়ংকর পাহাড়ী ঢল—হুড়মুড় করে এক ঘায়ে ভেঙে ফেলল সাঁকো, তার ইট-পাথর লোহালক্কড় যে কোন্ চুলোয় ভাসিয়ে নিয়ে গেল, তার আর পাত্তাই মিলল না।

শেষকালে দেশ-বিদেশের অনেক পণ্ডিত এসে, বিস্তর হিসেব-নিকেশ করে—হাজার হাজার মোহর খরচ করে এক জব্বর সাঁকো তৈরি করলেন। দিনকয়েক সেটা রইলও। তারপর আর কী? আবার পাহাড় থেকে নামল বরফ-গলা জলের ঘুর্ণি—হাজার হাজার বুনো মোষের মতো ডাক ছাড়তে ছাড়তে ছুটে এল, আর অত পরিশ্রম আর খরচের সাঁকোটা, প্রায় চোখের পলকেই উধাও!

দেশের লোক চটে লাল হয়ে গেল। তারা দল বেঁধে, পতাকা-টতাকা নিয়ে শহরের মেয়রের বাড়ির সামনে এসে দারুণ চ্যাঁচামেচি করতে লাগল: 'হয় সাঁকোটা বানিয়ে দাও, নইলে গদী ছেড়ে দাও।' মেয়রের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। গদী না হয় ছেড়েই

দেবো, কিন্তু এ কী কাণ্ড! একটা নদীর ওপরে কিছুতেই পুল বাঁধতে পারা গেল না! এ অপমান কখনো সহ্য হয়?

অনেক রাত হয়ে গেছে, সারা শহর ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু মেয়রের চোখে আর ঘুম নেই। রাত জেগে ঠায় টেবিলের সামনে বসে আছেন। সামনে কাগজপত্র, তাতে নতুন পুল তৈরির হিসেব! ইস্—এতগুলো টাকা! একেই বলে জলে যাওয়া, জলই নিয়ে গেল!

নদীর আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল দূর থেকে, মেয়রের মনে হলো—নদীটা তাঁকে ঠাট্টা করছে। রাগে দাঁত কড়মড় করতে করতে মেয়র বললেন, 'এ নদীকে জব্দ করতে পারে—না, ভগবানও নয়, একমাত্র শয়তান। আঃ—শয়তান এসে যদি সাঁকোটা বেঁধে দিত!'

বলবার অপেক্ষামাত্র। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে মেয়রের চাকর এসে ঢুকল।

'হুজুর, শ্রীশয়তান এসেছেন দেখা করতে।'

মেয়র ভয়ানক চমকে বললেন, 'কে এসেছে?'

'নাম বললেন—শ্রীশয়তান।'

শয়তান! মাঝ রাত্তিরের এই থমথমে নির্জনতায় একবারের জন্যে মেয়রের হাত-পা ভয়ে হিম হয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও ভেতরে।'

চাকর চলে গেল এবং শয়তান এসে ঢুকল ঘরে। চেহারা দেখে মনে হয়, পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের মতো বয়েস হবে। উঁচু চোয়াল, থুতনিতে ছাগল-দাড়ি, লম্বা মুখ, বাজপাখির ঠোঁটের মতো নাক; কোটরের ভেতরে চোখ দুটো দু'টুকরো আংরার মতো জ্বলছে। অনেকটা জার্মানদের মতো তার পোশাক, পরনে লাল টকটকে

প্যান্টালুন, গায়ে একটা লম্বা কালো কোট—আগুনরঙা তার উঁচু কলার। সার্কাসের ক্লাউনরা যেমন পরে—তেমনি একটা চুড়োওলা কালো টুপি তার মাথায়—তার ওপরে রক্তলাল একটা পাখির পালক থেকে থেকে দুলে উঠছে। পায়ে তার দুটো গোল গোল জুতো—শয়তানের পায়ের পাতা ছাগলের মতো বলে সে অন্য জুতো পরতে পারে না।

মেয়র কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলেন শয়তানের দিকে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে, বেশ খাতির করে, শয়তানকে সামনের চেয়ারটাতে বসালেন।

'তারপর বন্ধু'—একটু মিটমিট করে হেসে, মিঠে গলায় শয়তান বললে, 'শেষ পর্যন্ত বুঝি আমাকেই দরকার পড়ল তোমাদের!'

মেয়র খুব বিনীত হয়ে বললেন, 'আপনি না হলে আমাদের তো আর গতি দেখছি না।'

'ওই হতচ্ছাড়া পুলটার জন্যে—তাই না?'

'আজ্ঞে আপনি তো অন্তর্যামী, সবই জানেন।'

'পুলটা বুঝি খুবই দরকার?'

'আজ্ঞে নইলে যে আমরা নদী পার হতে পারছি না কিছুতেই।'

শয়তান বললে, 'হুম্।'

একটু চুপ করে থেকে, হাত কচলে মেয়র বললেন, 'তা দেখুন শয়তান মশাই, আপনি তো অতি মহৎ, দয়া করে ওই সাঁকোটা যদি আমাদের তৈরি করে দিতেন—'

মুচকে হেসে শয়তান বললে, 'আমিও ওই প্রস্তাব নিয়েই তোমার কাছে এসেছি।'

'তা হলে, কি ভাবে কাজটা—'

'পারিশ্রমিক পেলেই করে দেবো।'—শয়তান তার জ্বলন্ত চোখ দুটো মেলে মেয়রের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে শয়তানী দুর্বুদ্ধি ঠিকরে পড়ছিল।

মেয়র একটু কুঁকড়ে গিয়ে বললেন, 'সে তো বটেই—সে তো বটেই। পারিশ্রমিক তো দিতেই হবে।'

চেয়ারে নড়ে-চড়ে, পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে, শয়তান বললে, 'আমি যেরকম পুল তৈরি করে দেবো, তা হবে সবার সেরা। এমনটি আর কেউ কখনো দেখেনি।'

'তাতে আমারও কোনো সন্দেহ নেই—' মাথা নেড়ে জবাব দিলেন মেয়র। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'এর আগের সাঁকোটা তৈরি করতে আমাদের ছ' হাজার মোহর খরচ হয়েছিল। আমরা এবার তার দ্বিগুণ পর্যন্ত খরচা করতে পারি। কিন্তু তার বেশী আপনাকে আমরা দিতে পারব না।'

'মোহর—সোনা!'—শয়তান হেসে উঠল: 'তোমাদের সোনা দিয়ে আমি কী করব? আমি তো যত ইচ্ছে ও সব তৈরি করতে পারি। দেখবে?'

ঘরের ভেতরে ফায়ার-প্লেসে ঝাঁ-ঝাঁ করে আগুন জ্বলছিল। টক করে উঠে পড়ল শয়তান, তারপর ফায়ার-প্লেসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে গনগনে রাঙা একটা কয়লা তুলে নিলে। যেন রুটির দোকান থেকে একখানা কেক তুলে নিয়েছে—ভাবখানা এই রকম।

সেইটে মুঠো করে এনে সে মেয়রকে বললে, 'হাত পাতো।'

মেয়র উসখুস করতে লাগলেন।

শয়তান বললে, 'কিচ্ছু ভয় নেই, হাত পাতোই না!'

অগত্যা মেয়র হাত পাতলেন।

কিন্তু একি! শয়তান তাঁর হাতে যা দিলে—সে তো জ্বলন্ত কাঠকয়লা নয়। সেটা যে মস্ত একটা খাঁটী সোনার—! আর কী কনকনে ঠাণ্ডা সেটা! যেন এই মুহূর্তে সেটাকে খনি থেকে তুলে এনেছে কেউ।

খানিকক্ষণ অবাক্ হয়ে থেকে মেয়র সেটা নেড়ে-চেড়ে উলটে-পালটে দেখলেন। তারপর ফিরিয়ে দিতে গেলেন শয়তানকে।

'আরে না-না'—পায়ের ওপর পা তুলে, আবার জাঁকিয়ে বসে শয়তান বললে, 'ওটা আব তোমায় ফেরত দিতে হবে না। ও আমি তোমাকে উপহার দিলুম।'

মেয়র সোনার তালটা নিজের ব্যাগে পুরে বললেন, 'তা হলে সোনা যখন আপনি নেবেন না, তখন অন্য কোনোভাবেই আপনাকে পারিশ্রমিকটা দিতে হবে। কিন্তু সেটা যে কী, আমি তো তা বুঝতে পারছি না। আপনিই অনুগ্রহ করে বাতলে দিন।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল শয়তান। পরক্ষণেই কুটিলতায় ভরে উঠল তার জ্বলন্ত চোখ দুটো।

শয়তান বললে, 'আমার পারিশ্রমিক আর কিছুই নয়। পুল তৈরী হওয়ার পর সর্বপ্রথম যে ওটা পার হবে, তার আত্মাটাকে আমি নেব।'

শোনবার সঙ্গে সঙ্গে মেয়র শিউরে উঠলেন। শয়তান আত্মা নিয়ে যাবে! তার অর্থ যে কী সাংঘাতিক সে তো মেয়রের জানতে বাকী নেই। যে আত্মাকে শয়তান একবার অধিকার করবে, তার আর কখনোই নিষ্কৃতি মিলবে না। অনন্তকাল ধরে তাকে নরকের অন্ধকারে ঘুরতে হবে, শয়তানের দাসত্ব করতে হবে, শয়তানের যত বীভৎস পাপের কাজ—তাকেও তার অংশ নিতে হবে। চিরকালের মতো অভিশপ্ত হয়ে যাবে সে।

মেয়র চুপ করে রইলেন। অধৈর্য হয়ে শয়তান বললে, 'কী ভাবছ? উত্তর দিচ্ছ না যে? রাজী?'

একটু পরে মেয়র বললেন, 'রাজী।'

শয়তান বললে, 'তা হলে কাগজ-কলম বের করো। ভদ্রলোকের মতো চুক্তিপত্র তৈরি করে ফেলা যাক একটা!'

কাগজ-কলম নিয়ে মেয়র বললেন, 'চুক্তিপত্রে কী লিখতে হবে, আপনিই বলুন।'

শয়তান বলে গেল মেয়র লিখে নিলেন। চুক্তি হলো এই: আজ রাত ভোর হওয়ার আগেই শয়তান ওই দুর্ধর্ষ দুরন্ত নদীটার ওপর দিয়ে একটা সাঁকো তৈরি করে দেবে। সে সাঁকো যেমন সুন্দর হবে—তেমনি শক্তও হবে, আর পুরো পাঁচ শো বছর সেটা অক্ষয়-অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে, সর্বপ্রথমে এই সাঁকোটা যে পার হয়ে যাবে, তার আত্মার ওপর কায়েম হবে শয়তানের অধিকার। সে ভুল করেই যাক আর ইচ্ছে করেই পার হোক, শয়তানের কাছ থেকে তার আর পরিত্রাণ নেই।

চুক্তিপত্র লেখা হলো, দুটো নকলও করা হলো তার। যেমন নিয়ম, মেয়র সমস্ত শহরের পক্ষ থেকে সেই দুটোতে সই করলেন, শয়তানও গোটা গোটা করে নিজের নাম সই করে দিলে। তারপর একটা নকল নিলেন মেয়র, আর একটা নিয়ে শয়তান তার ঝোল্লা কালো কোটের পকেটে ভাঁজ করে পুরে ফেলল।

উঠে দাঁড়িয়ে, এক গাল হেসে শয়তান বললে, 'তা হলে কথা পাকা। কাল ভোরেই দেখবে তোমার সাঁকো তৈরী হয়ে গেছে!'

বলেই খুট খুট করে গোল গোল জুতোর আওয়াজ তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

রাতে মেয়রের আর ঘুম হলো না। পরদিন খুব ভোরে, শহরের জনপ্রাণীটিও জেগে ওঠবার আগেই, কাঁধে একটা মুখ-বন্ধ মস্ত ঝোলা নিয়ে তিনি নদীর ধারে গিয়ে হাজির হলেন।

শয়তানের যে কথা সেই কাজ। মেয়র দেখলেন, অতি চমৎকার, দারুণ পাকাপোক্ত এক পুল নদীর ওপর দিয়ে তৈরী হয়ে রয়েছে। আর পুলের ওপারে, ভোরের ঝাপসা আলোয় একটা পাথরের ওপরে বাঘের মতো থাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান। যে হতভাগা না জেনে সকলের আগে এই সাঁকোটা পার হবে—তার আত্মাটাকে অমনি সে খপাৎ করে কেড়ে নেবে। তার পারিশ্রমিক।

মেয়রকে সাঁকোর মাথায় দাঁড়াতে দেখে শয়তান হাঁক দিয়ে বললে, 'দেখছ তো, আমি কি রকম কথার লোক!'

'আমিও কথার লোক'—মেয়র জবাব দিলেন।

শুনে, শয়তানের ধোঁকা লাগল।

'সে কি! তুমি নিজেই প্রথম সাঁকো পেরিয়ে আমার খপ্পরে পড়তে চাও নাকি? এত বড়ো আত্মত্যাগ?'

'আত্মত্যাগের নিকুচি করেছে। আমাকে কি তুমি এমন গর্দভ ভেবেছ?'—বলেই মেয়র কাঁধের মস্ত ঝোলাটা নামিয়ে খুলতে আরম্ভ করলেন।

শয়তান বললে, 'ওটা কী হচ্ছে?'

উত্তরে মেয়র বললেন, 'ভু-উ-উ—ভৌ-ঔ-ঔ—'

শয়তান অবাক্ হয়ে বললে, 'তার মানে?'

মেয়র বললেন, 'তার মানে ভৌ-ঔ-ঔ—'

'অ্যাঁ!'

বলতে বলতেই মেয়র থলেটা খুলে ফেললেন। আর তার

ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল একটা বদমেজাজী রাস্তার নেড়ী কুকুর—সেটার ল্যাজে আবার ভাঙা একটা সস্প্যান বাঁধা রয়েছে। থলে থেকে ছাড়ান পেতেই সেটা সাঁকো পেরিয়ে ভোঁ-দৌড় !

মেয়র বললেন, 'নাও হে শয়তানদা—তোমার আত্মা নিয়ে যাও। এই কুকুরটাই তো প্রথম সাঁকো পার হয়েছে।'

শয়তান বললে, 'বা-রে, তা কী করে হয় ? কুকুরের আত্মা দিয়ে কোন্ ঘোড়ার ডিম হবে ? আমি তো মানুষের আত্মার কথা বলেছিলুম।'

মেয়র বললেন, 'বার করো চুক্তিপত্র। তাতে কেবল আত্মা লেখা আছে। মানুষ, কুকুর, গোরু, ছাগল—কিছুই আলাদা করে বলা নেই। অতএব, তোমার পারিশ্রমিক তুমি পেয়ে গেলে। এবার আনন্দে নাচতে নাচতে নরকে চলে যাও !'

রেগে আগুন হলো শয়তান। তার হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। আচ্ছা বোকা বানিয়েছে তো তাকে ! সে হলো মূর্তিমান শয়তান, তার মগজে যত কুবুদ্ধির কারখানা, আর লোকটা এমন করে তাকেই বেকুব করে দিলে !

'পুলটাই ভেঙে ফেলব'—শয়তান ভাবল। কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করে সে সাঁকোর এক টুকরো নুড়িও নড়াতে পারল না। চুক্তি অনুসারে সেটা পাঁচ শো বছরের মতো অটল হয়ে আছে—বজ্রের মতন তার গাঁথুনি। খেপে গিয়ে শয়তান একটা হাজার মন পাথর ছুঁড়ে মারল সাঁকোর ওপর। সাঁকোয় টোলটি পর্যন্ত খেলো না, তার বদলে পাথরটাই গুড়ো গুড়ো হয়ে ঝুরঝুর করে ঝরে গেল নদীর জলে।

দাঁত কিড়মিড় করে শয়তান বললে, 'তা হলে ওই বজ্জাত মেয়রটাকেই মেরে ফেলি।' আর বলেই যেই মেয়রের মাথা লক্ষ্য

করে পাথর ছুঁড়তে যাচ্ছে, অমনি মেয়র বললেন, 'লে ভোলা —ছু-চ্ছু-চ্ছু'—

বস্তার মধ্যে আটকে থেকে নেড়ী কুকুর চটেই ছিল, আর বলতে হলো না। তার ওপরে ল্যাজে ভাঙা সস্‌প্যান বাঁধা থাকায় তার মেজাজ আরো খারাপ। আর শয়তানের বিতিকিচ্ছিরি চেহারাও তার ভালো লাগেনি। সে-ও 'ঘোঁ—ঘঁক্'—বলে শয়তানকে তাড়া করল।

'বাপ্ রে—মা-রে'—বলে শয়তান দে দৌড়!

কিন্তু নেড়ী কুকুর কি তাকে ছাড়ে? 'ঘোঁ—ঘঁক্—ঘঁক্' করে সমানে ছুটে চলল তার পেছনে!

মেয়র আনন্দে নাচতে শুরু করে দিলেন, কিন্তু কোটের পকেট থেকে ধোঁয়া বেরুতে আর গায়ে গরম ছ্যাঁকা লাগতে নাচ বন্ধ হয়ে গেল। হুড়মুড় করে কোটটা ছুঁড়ে ফেললেন তিনি। বাপ্‌স্ —একটুর জন্যে প্রাণ বেঁচে গেছে। পকেটে শয়তানের সেই সোনার তাল কখন আবার জ্বলন্ত কয়লা হয়ে গিয়ে জামায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাঁর।

ওদিকে শয়তান সেই যে ছুটে পালালো, আর কোনোদিন তার টিকিটিও দেখা গেল না। নেড়ী কুকুরটা আজও তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে কিনা কে জানে! চুক্তিমতে কুকুরের আত্মা তো অনন্তকালের জন্যে তার সঙ্গী।

আর সেই সাঁকোটা? দুরন্ত নদীটার বুকের ওপর সে পাঁচ শো বছরের জন্যে অক্ষয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—

ঘোড়ামামার কাটলেট



ঘোড়া মামা বললেন, 'এই যে পেলারাম, কী বেপার?'

ঘোড়া মামা মোটেই ঘোড়া নন, কিংবা কারুর মামাও নন। মুখে বড়ো বড়ো দাড়ি, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, একটা থলে কাঁধে

নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অভ্যেস। হঠাৎ তাঁকে দেখে কাগজ কুড়ুনে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কাগজ তিনি কুড়োন না। ঘোড়া মামার ধারণা, লোকে না বুঝে রাস্তায় অনেক কাজের জিনিস ফেলে দেয়, সেগুলো কুড়িয়ে রাখলে তা দিয়ে কত কী যে হতে পারে, তা বলে বোঝানো যায় না। এই ধরো, একদিন ঘোড়া মামা জুতোর একটা শুকতলা পেলেন; একমাস বাদে হয়তো খানিক চামড়া পাবেন; আরো ছ'মাস বাদে একটা সোল পেয়ে যেতে পারেন। এগুলো একসঙ্গে সেলাই করে নিলেই একপাটি জুতো বিনে পয়সায় তৈরি হয়ে গেল। এইভাবে আর এক বছর খুঁজে বেড়ালে হয়তো আর এক পাটিরও জোগাড় হয়ে যাবে। তখন একেবারে ফ্রীতে একজোড়া জুতো-- আর আজকাল জুতোর যা দাম!

এ থেকে যদি ভেবে থাকো যে ঘোড়া মামার অবস্থা খারাপ, তা হলে ভুল করেছো। ঘোড়া মামা মোটেই গরীব নন। তাঁর নিজের বাড়ী আছে, একতলা দোতলায় ভাড়াটে আছে, তারকেশ্বরে নিজেদের দেশে অনেক জমিজমা আছে। আসলে স্বভাবই এই। তাঁর বাড়ীর তেতলার ঘরে উঠলেই দেখবে-- দেশলাইয়ের খাপ, খালি সিগারেটের বাক্স, ছেঁড়া রিবনের টুকরো, খালি কৌটো থেকে শুরু করে ফেলে দেওয়া তোবড়ানো সাইন বোর্ড পর্যন্ত জমানো রয়েছে। একটা সাইন বোর্ডে লেখা আছে: 'এখানে উত্তম চিঁড়া পাওয়া যায়', আর একটাতে লেখা আছে: 'পাগলের মহৌষধ'। শেষটা ঘোড়া মামাকে খাওয়াতে পারলে ভালো হতো---কিন্তু সেটা কোথায় পাওয়া যাবে আমাদের জানা নেই।

ঘোড়া মামার জিভে একটু দোষ আছে। প্যালারামকে বলেন, 'পেলারাম', ব্যাপারকে 'বেপার', চ্যাঁচানোকে 'চিঁচানো'—এই

রকম। তাই আমাকে বললেন, 'এই যে পেলারাম, কী বেপার?'

দাড়ির ফাঁকে ঘোড়া মামার গোটা কুড়িক দাঁত বেরিয়ে এল। আর তাই দেখেই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার। ঘোড়া মামার পাল্লায় পড়ে দু-দুবার আমার হাড়ির হাল হয়েছে।

বললুম, 'ব্যাপার আর কী ঘো—' বলেই সামলে নিলুম, 'মানে মামা, আমি ক্যাবলার জন্যে ওয়েট করছি এখানে।'

'কেবলা? ও মিত্তিরদের কেবলা? কেনো?'

'ও আমাকে কাটলেট খাওয়াবে বলেছে।'

'তা—কেট্‌লেট্‌!'—ঘোড়া মামা আবার দাড়ির ফাঁকে দন্তশোভা বিকাশ করলেন: 'তা বেশ তো, চলো না আমার সঙ্গে। আমিই তোমায় কেট্‌লেট্‌ খাওয়াব।'

আমি বললুম, 'সরি ঘো—মানে মামা, একবার আপনি আমাকে ক্ষীরমোহন, চমচম, ছানার জিলিপি এইসব খাওয়াবেন বলে পটলডাঙা থেকে এস্‌প্ল্যানেড পর্যন্ত হাঁটিয়েছেন, তারপর ল্যাজে দড়ি বাঁধা একটা নেংটি ইঁদুর ধরিয়ে দিয়ে—'

'কেনো—কী অন্যায় হয়েছে? সেই ইঁদুর বাড়ীতে নিয়ে গেলে তোমার বাবা বিড়েল আনতেন—' ঘোড়া মামা বলে যেতে লাগলেন: 'সেই বিড়েলকে দুধ খাওয়াবার জন্যে তোমার বাবা গোরু পুষতেন, সেই গোরুর দুধ থেকে ক্ষীরমোহন, ছেনার জিলিপি—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'খুব হয়েছে, আর আমার দরকার নেই। সেই নেংটি ইঁদুর নিয়ে বাড়ী গেলে বড়দা আমাকে একটা বিরাশী সিক্কার চড় বসাতো, তারপর ইঁদুরটাকে টেনে একেবারে শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ফেলে দিত। ক্ষীরমোহন, ছানার জিলিপি—হুঁ। যত সব বোগাস। মাঝখান থেকে রবিবারের সকালে আমাকে পাক্কা দেড় মাইল হাঁটালেন আপনি।'

'আহা পেলারাম, তুমি বুঝতে পারছ না। সব কাজ প্লেন করে (মানে প্ল্যান করে) করতে হয়। চমচম ক্ষীরমোহন ঝাঁ করে খেলেই হলো? একটা এরেনজমেণ্ট করতে হয় না? আজ তুমি চলো আমার সঙ্গে, নিশ্চয় তোমায় কেট্‌লেট্‌ খাওয়াব।'

'আবার হয় হাওড়া ব্রীজ, নয় শ্যামবাজার পর্যন্ত হাঁটাবেন তো? আর আপনার সঙ্গে সঙ্গে জুতোর সুকতলা, রাংতা, ঘুড়ির কাগজ, রাস্তার পেরেক, এই সব কুড়োতে হবে? শেষে একতাল গোবর আমার হাতে তুলে দিয়ে বলবেন---এই গোবর থেকে ঘুঁটে হবে, ঘুঁটে দিয়ে উনুন ধরানো হবে, উনুন ধরালে কড়াই চাপবে, কড়াই চাপলে তোমার মা কাটলেট ভাজবেন—চালাকি! ঘো—সরি মামা, ও-সবের মধ্যে আমি আর নেই।'

'তুমি মিথ্যে এফরেড হচ্ছ পেলারাম।'—ঘোড়া মামা মনে ভীষণ ব্যথা পেলেন: 'আজ তোমায় কোথাও যেতে হবে না, কিচ্ছু কুড়োতে হবে না। আমার বাড়ীতে গেলেই তোমার কেটলেটের ব্যবস্থা হবে। তোমার কেবলা তো এল না—চিঁচামিচি না করে আমার সঙ্গেই তুমি চলো।'

ক্যাবলা যে আসবে না, সে তো বুঝতেই পারছি। বর্ধমান থেকে ওর ছোট মামা এসেছে শুনেছি, আর যুদ্ধের ফিলিম দেখানো হচ্ছে—নিশ্চয় ক্যাবলা মামার সঙ্গে সেই ফিলিম দেখতে গেছে। টেনিদা কলকাতায় নেই, বেড়াতে গেছে গোবরডাঙায় পিসিমার বাড়ীতে, হাবুল সেন সেই যে পরশু থেকে বালীগঞ্জে বড়দির বাড়ী গিয়ে বসে রয়েছে—এখনো ফেরবার নাম করছে না। পুজোর ছুটির দিনগুলোতে ভারী একা পড়ে গেছি আমি।

'চলো হে পেলারাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে থেকে আর কী করবে?'—ঘোড়া মামা আবার ডাকলেন। ভাবলুম, এস্‌পার

ওস্পার যা হোক একটা হয়েই যাক। বলা তো যায় না—জুটেও যেতে পারে একটা কাটলেট—চান্স্ নিয়ে দেখাই যাক না! আজ তো আর রাস্তায় রাস্তায় কুড়িয়ে বেড়াতে হবে না, ভয় কিসের?

ঘোড়া মামার সঙ্গেই গেলুম।

একতলা দোতলায় ভাড়াটে, ঘোড়া মামা তেতলায় একটা ঘর আর এক টুকরো বারান্দা নিয়ে থাকেন। সেই ঘরের দিকে তাকিয়েই আমার প্রায় দমবন্ধ হয়ে এল।

কী নেই সেখানে?

সারা কলকাতার যত ফেলে-দেওয়া জিনিস—যত কাগজের বাক্স, কাঠের টুকরো, ক্ষয়ে-যাওয়া দাঁতের বুরুশ, ছেঁড়া জুতো, মরচে পড়া পেরেক, 'এখানে উৎকৃষ্ট চিঁড়া পাওয়া যায়', 'পাগলের মহৌষধ'—কিছুই আর বাকী নেই; আর স্তূপাকার কাগজের টুকরো তো আছেই, যত কাগজ-কুড়ুনের অন্ন মেরে দিয়েছেন ঘোড়া মামা। তাকিয়েই সমস্ত মনটা আঁতকে উঠল—যেন সারা গায়ে এক্জিমা কুট কুট করছে এই রকম বোধ হলো আমার।

বললুম, 'ঘোড়া—'

'ঘোড়া? ঘোড়া কী?'

জিভ কেটে বললুম, 'সরি, মামা। আমি বলছিলুম কি মামা, আপনার ওই ঘরে বসে কাটলেট খাওয়া চলবে না। ঘরটা—কী বলে ইয়ে, বিষম নোংরা!'

'নোংরা!'—ঘোড়া মামা ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেনঃ 'তুমি কী বলছ হে পেলারাম! ওই ঘরে যা জিনিস আছে তা দিয়ে আমি

দেড় পাটি জুতো বানাতে পারি, ছ'টা ঘুড়ি তৈরি করতে পারি, টিনের কৌটোয় হাতল লাগিয়ে পাঁচটা মগ বানাতে পারি—'

আমি বললুম, 'থাক থাক। জুতো, ঘুড়ি কিংবা টিনের মগে আমার দরকার নেই। আমি জানতে চাই—কাটলেট কোথায়? আর সেটা আপনার ওই ঘরেই আছে কিনা—মানে রাস্তা থেকে পচা-টচা একটা কুড়িয়ে এনেছেন কিনা।'

'পোচা? রাস্তার পোচা কেটলেট?'—ঘোড়া মামা যেন ভীষণ ব্যথা পেলেন আবার: 'তুমি কি আমায় এতই ছোটলোক ভাবলে পেলারাম? তোমার জন্যে কেটলেট আসবে পাড়ার "দি গ্রেট আবার খাবো" রেষ্টুরেন্ট থেকে—গরম-গরম—প্রাণকাড়া—'

শুনতে শুনতে আমার রোমাঞ্চ হলো—চোখের সামনে ঝিলিক দিয়ে গেল "দি গ্রেট আবার খাবো" রেস্তোরাঁর এক জোড়া গরম কাটলেট। এমন যে ঘোড়া মামা—যাঁর গাল ভর্তি ঝব্বু দাড়ি আর মুখভর্তি কাঁটাল-বিচির মতো দাঁত, যিনি মাসে একবারও স্নান করেন কিনা সন্দেহ, দশ হাত দূর থেকেও যাঁর গায়ের চিম্‌সে গন্ধ পাওয়া যায়, ইচ্ছে করল, দু-হাতে জাপটে ধরি তাঁকে।

বললুম, 'ঘো—আই মীন মামা, আর দেরী কেন তা হলে? আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না—টাকা দিন, আমি এক্ষুনি দুটো গরম কাটলেট খেয়ে আসব—কথা দিচ্ছি আপনাকে। যাকে বলে, ওয়ার্ড অব্ অনার!' ঘোড়া মামা হাসলেন।

'আহা-হা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন পেলারাম? এস্‌বে এস্‌বে, কেট্‌লেট্ এস্‌বে। কিন্তু কেট্‌লেট খাওয়ার জন্যে রেডি হতে হবে না? খেলেই হলো?'

'রেডি? রেডি আবার কী?'—আমি উৎসাহিত হয়ে বললুম, 'রেডি তো আমি হয়েই রয়েছি। কাটলেট খেতে আমি ভীষণ

ভালবাসি, ক্যাবলার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দারুণ খিদেও পেয়েছে—পেলেই তক্ষুনি খেয়ে ফেলব···আপনি দেখে নেবেন।'

'আহা, সে তো দেখবই'—ঘোড়া মামা আবার একমুখ দাড়ি নিয়ে হাসলেন ঃ 'তার আগে একটু হাত লাগাও।'

'কিসে হাত লাগাব ?'

'কেট্‌লেটের জন্যে।'

'কাট্‌লেট্‌ পেলে তক্ষুনি হাত লাগাব। এক সেকেণ্ডের মধ্যেই।'

'দেখো, পেলারাম, একটু কোষ্টো করতে হয়, নইলে কি আর কিষ্টো মিলে ? কেট্‌লেটের জন্যেও একটু পরিশ্রম করতে হবে বই কি।'—বলতে বলতে ঘোড়া মামা ঘরের ভেতর থেকে ঘড়্‌ঘড় করে একটা পুরোনো ইজি-চেয়ারের ফ্রেম টেনে আনলেন ঃ 'এসো আগে এটাকে মেনেজ করি।'

'এ আবার কী ? এটাকে কোথায় পেলেন ?'

'মুখুজ্জেদের বাড়ীর পেছনে—আস্তাকুঁড়ে।'

'আরে রাম রাম !'—আমি নাক সিঁটকে বললুম, 'আপনি যে কী একটা ঘো -আই মীন মামা—যেখান-সেখান থেকে যা-তা কুড়িয়ে আনেন !'

'যা-তা ? যা-তা হলো এটা ? পুরোনো কাঠ, ভারী পোক্ত জিনিস। মুখুজ্জেদের আর কী—বড়লোক, যখন যা খুশি ফেলে দিলেই হলো। কিন্তু এ দিয়ে যখন আমি একটা ফেস্‌টো ক্লেস ইজি-চেয়ার বানাব, তখন ওই কোট-পেটুল পরা ছোট মুখুজ্জেও হাঁ করে থাকবে। বুঝবে, কী জিনিস তারা ফেলে দিয়েছে।'

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, 'কিন্তু কাট্‌লেট ?'

'আঃ—কেটলেট কেটলেট করে তুমি যে ক্ষেপে গেলে পেলারাম !'

—ঘোড়া মামা ঘর থেকে এবার যতগুলো ভাঙা ছাতার কালো কালো কাপড়, রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া গিঁট মারা কতটা টোয়াইন সুতো আর দুটো মরচে পড়া চট সেলাইয়ের ছুঁচ বের করে আনলেন : 'এসো—আগে চেয়ারটাকে বেনিয়ে ফেলি। চেয়ার হয়ে গেলেই কেটলেট—বুঝেছ ?'

'বুঝেছি—' গোঁজ হয়ে জবাব দিলুম আমি। অর্থাৎ আমাকে আদর করে কাটলেট খাওয়াবেন, খামোকাই খাওয়াবেন—এমন পাত্তর ঘোড়া মামা নন। তার আগে এই নড়বড়ে একটা বিচ্ছিরি ফ্রেমে এইসব ফুটোকাটা ছাতার কাপড় সেলাই করে, তাঁকে ইজি-চেয়ার বানিয়ে দিতে হবে! কাটলেট হলো তারই পারিশ্রমিক!

ঘোড়া মামা বললেন, 'তোমায় বেশী কোষ্টো করতে হবে না। দুটো পেরেক ঠুকতে হবে, একটু সিলাই করতে হবে আমার সঙ্গে—ব্যস!'

'সেলাই ?'—বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমি কোনোদিন সেলাই করেছি নাকি ? আমি কি দর্জি ?'

'আহা—চটো কেনো পেলারাম ? তুমি দর্জি হবে কেনো ? কিন্তু সব কাজ তো শিখতে হয়—যাকে বলে সেলেফ-হেলেপ!—এসো লেগে যাও।'

কী আর করা—এক জোড়া কাটলেটের আশায় আমি লেগে গেলুম। ঠিক কথা—বিনা খাটনিতে কে আর কাকে খেতে দেয়! মনে মনে বললুম, 'প্যালারাম—জাগো, রাগো এবং লাগো—তারপরে, নিজের শ্রমের অন্ন—অর্থাৎ কিনা কাটলেট—খুশি হয়ে খাও।'

ছেঁড়া ছাতার কাপড়—দু'ভাঁজ করে সেলাই করা—চারটিখানি কথা নাকি! তার ওপর আবার ঘোড়া মামার গজগজানি।

'আঁ—উ কী হচ্ছে ? অমনি করে সিলাই করে নাকি ? ওতো

এখুনি খুলে যাবে।'

ঘোঁ-ঘোঁ করে বললুম, 'আমি তো আর দর্জি না।'

'আরে দর্জি না হলে কী হয়—হেলেপ, সেলেফ হেলেপ! এই এমনিভাবে পোটাপোট্—'

'পোটাপোট' মানে পটাপট সেলাই করতে গিয়ে খুচ করে ছুঁচের ডগা বিঁধে গেল বুড়ো আঙুলে।

'উরেব্বাপ্'—বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

'দেখো একবার কেণ্ডো (মানে, কাণ্ড)! আমি কি তোমায় আঙুল সিলাই করতে বলেছি নাকি?' বিরক্ত হয়ে ঘোড়া মামা জানতে চাইলেন।

'এক্স্কিউজ মী ঘোড়া—মানে মামা, আমি আর সেলাই করতে পারব না—' বিদ্রোহ করে এবারে আমি বললুম, 'যথেষ্ট খেটেছি, এবার টাকা দিন, কাটলেট খেয়ে আসি।'

'এ্যাঃ, কেটলেট কেটলেট করে এ পাগল হয়ে যাবে দেখছি।' —ঘোড়া মামা আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর একটু —এই একটুখানি। তা হলেই কেটলেট রেডি হয়ে যাবে।'

আরো আধ ঘন্টা ধ্বস্তাধ্বস্তি করে, আরো একবার আঙুলে ছুঁচ ফুটিয়ে, সেই অত্যাশ্চর্য ইজিচেয়ার সেলাই শেষ হলো। তখন আমি বেদম হয়ে বসে পড়েছি। আঙুল টনটন করছে, ঘাড় ব্যথা করছে, সারা গা বেয়ে টপটপ করে ঘাম পড়ছে। সেই অবস্থায় আমি বললুম, 'কাট্লেট?'

ঘোড়া মামা হেসে বললেন, 'হেঁ, কেট্লেট। ইজিচেয়ারে বসে কেট্লেট্ খেতে হয়। কিন্তু কেট্লেট রাখবার জন্যে তো একটা টিবিল চাই। সেই টিবিল বানাতে হবে। পেলারাম, কাল থেকে রাস্তায় আমরা টিবিলের কাঠ খুঁজব। তুমিও আমার

সঙ্গে সঙ্গে খুঁজবে—কেমোন? ধরো. এক বছর দেড় বছরের মধ্যে টিবিলের কাঠ হয়ে যাবে। তারপর টিবিল তৈরি হলে—'

আমি ক্ষেপে গিয়ে বললুম, 'থামুন—থামুন। তারপর ভাঙা প্লেটের টুকরো জোগাড় করে করে, পুডিং জুড়ে ছ'মাস পরে প্লেট তৈরি হবে, ভাঙা কাচ কুড়িয়ে আরো ছ'মাস পরে গ্লাস—'

'হেঁ-হেঁ পেলারাম, মিথ্যে চিঁচাচ্ছ কেন? কেটলেট খাওয়া কি সোজা বেপার? ধৈর্য ধরতে হয়, কত এরেনজমেণ্ট করতে হয় তার জন্যে। দু'বছর, তিন বছর, চার বছর—যতদিন বাদেই হোক, কেটলেট তোমায় আমি খাওয়াবই। তবে কিনা তুমিও একটু হেলেপ করবে—বুঝেচো না? এই বছর দু-তিন আমার সঙ্গে রাস্তায় একটু কুড়ুবে—ব্যস, তার পরেই গরমা-গরম কেটলেট। হেঁঃ হেঁঃ হেঁঃ—'

বলে, দিলখোলা হাসি হেসে ঘোড়া মামা সেই ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন। এবং—এবং সেই রদ্দিমার্কা ছাতার কাপড়, পুরোনো ফ্রেম, আর আমার অনবদ্য সেলাই!

ফড়-ফড়-ফড়ড়াং! খটাং!

ভাঙা ইজিচেয়ারের ফ্রেমের মধ্যে চার হাত-পা তুলে চেঁচাতে লাগলেন ঘোড়া মামা: 'বেজায় আটকে গিয়েছি পেলারাম--টেনে তোলো—টেনে তোলো—'

এবার আমি স্পষ্ট গলায় বললুম, 'না ঘোড়া মামা, না। টেনে আমি তুলব না। আপনি ওর মধ্যে হাত-পা ছুঁড়তে থাকুন—ছুঁড়তেই থাকুন। ছুঁড়তে ছুঁড়তে এক মাস, দু'মাস, তিনমাস পরে আস্তে আস্তে আপনার হাত দুটো ডানা হয়ে যাবে। তারপর আপনি আকাশে ফ্রেমসুদ্ধ উড়তে থাকবেন, উড়তেই থাকবেন, তারপর আরো দু-তিন বছর রোদে জলে, বৃষ্টিতে পুড়ে—ফ্রেমটা খসে

পড়ে যাবে—তখন আপনি ফ্রী! ইজিচেয়ারের ফ্রেম থেকে বেরুনো কি সোজা কথা ঘোড়া মামা? কত ধৈর্য ধরতে হয়, কত এরেনজমেণ্ট করতে হয়—কেষ্টো না করলে কি আর কিষ্টো মিলে?'

এই বলে—এক লাফে, আমি রাস্তায় নেমে পড়লুম।

খাঁড়ামশাই



বংশীবদন খাঁড়ার ছেলে হংসবদন—যার ডাকনাম চিচিঙ্গে—সে ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী এল।

ঝোলাগুড়ের ব্যবসায়ী বংশীবদন তখন নাকের নীচে চশমা নামিয়ে দু'শো বত্রিশ মণ গুড়ের হিসেব করছিলেন। বিরক্ত হয়ে

বললেন, ক্যা হয়েছে রে চিচিঙ্গে? অমন করে শেয়ালের বাচ্চার মতো কাঁদছিস কেন?

শেয়ালের বাচ্চা নিশ্চয় ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদে না, কিন্তু বংশীবদন ও-সব গ্রাহ্য করেন না। আর 'কি'—'কে'—এগুলোকে তিনি ক্যা বলেন।

চিচিঙ্গে বললে, হেড মাস্টার আমায় কেলাসে তুলে দেয়নি।

—ক্যা বললি?

—হেড মাস্টার আমাকে—

ঠাঁই করে বংশীবদন একটি চড় বসিয়ে দিলেন চিচিঙ্গের গালে। বললেন, পাঁটাব বাচ্চা কোথাকার! হেড মাস্টার! তোর গুরুজন না? বিদ্যের গুরু। বাপের চেয়েও বড়ো। কেন, মাস্টার মশাই —হেড স্যার এইসব বলতে পারিসনে? 'তুলে দেয়নি' নয়—তুলে দেননি। মনে থাকবে?

চড় খেয়ে চিচিঙ্গের কান্না বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোঁজ হয়ে, ঘাড় নেড়ে সে জানালো—মনে থাকবে।

বংশীবদন বললেন, কিন্তু ক্যা হয়েছে? কেন দেননি ওপর কেলাসে তুলে?

—আমি অঙ্ক আর ভূগোলে পাশ করতে পারিনি। সবাই বলছে, তুই পেসিডেনের ছেলে হয়ে—

বংশীবদন রেগে আগুন হয়ে গেলেন: আমার বাপের নামে ইস্কুল, আমি জমি দিইছি, বাড়ী করে দিইছি—আর আমার ছেলেকেই ফেল করানো? আচ্ছা, তুই ভেতরে যা—আমি দেখছি।

চিচিঙ্গে ভেতরে চলে গেলে বংশীবদন তক্ষুনি একটা চিঠি লিখলেন হেড মাস্টার শ্রীনাথ আচার্যিকে। লিখলেন, 'মহাশয়, অবিলম্বে আমার সঙ্গে দেখা করিবেন। আর চিচিঙ্গের কেলাসের

একখানা ভূগোল আর একখানা অঙ্কের প্রশ্নপত্র সঙ্গে লইয়া আসিবেন।'

হেড মাস্টার আচার্যি মশাই তখন কেবল প্রমোশন দিয়ে, খুব ক্লান্ত হয়ে, নিজের ঘরে বসে হুঁকোয় টান দিয়েছেন। এমন সময় বংশীবদনের লোক ভূষণ মণ্ডল চিঠিটা এনে হাজির করল। বললে, বাবু আপনাকে এক্ষুনি যেতে বলেছেন।

—যাচ্ছি—তটস্থ হয়ে হেড মাস্টার বললেন, তুমি এগোও, আমি আসছি।

ভূষণ চলে গেল। তামাক খাওয়া মাথায় রইল, হুঁকো নামিয়ে হেড মাস্টার ডাকলেন, ওহে বিমল!

বিমলবাবু ইস্কুলের জুনিয়ার টিচার। কিন্তু ছেলেমানুষ হলে কী হয়, যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি চটপটে। খুব ভালো পড়ান। সব কাজেই হেড মাস্টার তাঁর পরামর্শ নেন।

বিমলবাবু আসতেই হেড মাস্টার বললেন, দ্যাখো কাণ্ড। খাঁড়া মশাই ডেকে পাঠিয়েছেন। তখনই তোমায় বললুম, প্রেসিডেন্টের ছেলে—দিয়ে দিই প্রমোশন—কী হবে ঝামেলা করে! কিন্তু তোমার কথায় ওকে আটকে দিলুম, এখন—

বিমলবাবু বললেন, স্যার, স্কুলের একটা নিয়ম তো আছে। প্রেসিডেন্টের ছেলে তো কী হয়েছে, ফেল করলেও প্রমোশন দিতে হবে? তাহলে গরীবের ছেলেরা আর কী দোষ করল—সব্বাইকেই তো পাশ করিয়ে দেওয়া উচিত।

—আরে, উচিত অনুচিত আর মানছে কে! যার টাকা আছে, ও-সব তার বেলায় খাটে না। এখন খাঁড়ামশাই যদি খেপে যান, তাহলে আমাদের অবস্থাটা ভাবো! তাঁর টাকায় স্কুল, তিনি

প্রেসিডেন্ট। এদিকে সায়েন্স ব্লকের জন্যে সামনের মাসে পনেরো হাজার টাকা দেবেন কথা আছে। এখন যদি বিগড়ে যান, আমরা মারা পড়ে যাব।

বিমলবাবু মাথা নেড়ে বললেন, আমার তা মনে হয় না স্যার। খাঁড়ামশাই অত অবিবেচক নন। টাকা অনেকেরই আছে, কিন্তু এ-রকম মহৎ মানুষ দু'জন দেখা যায় না। স্কুল করেছেন, হেল্‌থ সেণ্টার খুলিয়েছেন, দু'মাইল রাস্তা করেছেন। নিজের খরচে গ্রামের লোকের জন্যে তিনটে টিউবওয়েল করে দিয়েছেন। কত লোককে যে দু-হাতে দান করেন তার হিসেব নেই। তিনি নিশ্চয় বুঝবেন।

ব্যাজার মুখে হেড মাস্টার মশাই বললেন, কে জানে! সেকেলে লোক, মেজাজের থই পাওয়া শক্ত। যা হোক, তুমিও চলো। তুমি সঙ্গে থাকলে একটু ভরসা পাবো।

—আচ্ছা, চলুন।

দু'জনে গিয়ে হাজির হলেন খাঁড়ামশাইয়ের বাড়ীতে।

বংশীবদন দু'শো বত্রিশ মণ ঝোলা গুড়ের কতটা ইঁদুরে খেয়েছে, নাগরী ফুটো হয়ে কতটা নষ্ট হয়েছে, কতটাই বা আরশোলা-পিঁপড়ের পেটে গেছে—এইসব লোকশানের হিসেবের মধ্যে তলিয়ে ছিলেন। হেড মাস্টার আর বিমলবাবুকে দেখে প্রথমটায় বললেন, ক্যা ব্যাপার, আপনারা---বলতে বলতেই তাঁর চিচিঙ্গের কথাটা মনে পড়ে গেল।

---বসুন বসুন।---তার পরেই বিনা ভূমিকায় তাঁর সোজা জিজ্ঞাসা : চিচিঙ্গে ওপরের কেলাসে উঠতে পায়নি কেন?

হেড মাস্টার মশাই একটা ঢোক গিলে বললেন, আজ্ঞে, ও অঙ্কে আর ভূগোলে ফেল করেছে।

—কত পেয়েছে?

—অঙ্কে সাত। ভূগোলে বারো।

—হুম্!—বংশীবদন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, ওদের কেলাসের যে দুটো কোশ্চেন আনতে বলেছিলুম, এনেছেন ?

—আজ্ঞে এনেছি—বিমলবাবু তক্ষুনি দু'খানা প্রশ্নপত্র এগিয়ে দিলেন খাঁড়া মশাইয়ের হাতে।

চশমাটাকে তুলে, জায়গামতো বসিয়ে, বংশীবদন উল্‌টে-পাল্‌টে প্রশ্ন দু'খানা পড়লেন। একবার বললেন, 'ইরে বাবা', একবার বললেন, 'ও-ওয়াফ', আর একবার বললেন, 'এ-সব ক্যা কাণ্ড!' মাথার ওপরে যেন খাঁড়া উঁচিয়ে রয়েছে, এইভাবে তটস্থ হয়ে বসে থাকলেন দুই মাস্টারমশাই।

তারপর :

—এটা বুঝি ভূগোল ?

হেড মাস্টার বললেন, আজ্ঞে।

—অ। কেরল রাজ্যের রাজধানী ক্যা ? হুম্। ভারতের কোথায় কোথায় কয়লা ও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়, তাহা বল। হু-হুম্। ভারতের একখানি মানচিত্র আঁকিয়া গঙ্গা নদীর উৎপত্তি স্থল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত প্রধান প্রধান শহরগুলি—বেশ, বেশ।—প্রশ্নপত্রটি এক দিকে সরিয়ে রেখে খাঁড়ামশাই বললেন, এ-সব না জানলে বুঝি বিদ্বে হয় না ?

কথার সুরটা বাঁকা। হেড মাস্টার ঘামতে লাগলেন।

বললেন, আজ্ঞে, নিজের দেশটাকে তো জানতে হবে!

—ক্যা ? নিজের দেশ ? তা ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা হেড মাস্টার মশাই, আপনি তো জ্ঞানী লোক, নিজের দেশের সব খবরই জানেন—দু-দুবার এম. এ. পাশ করেছেন। বলুন দিকিনি, আমাদের এই জেলায় ক'টা গ্রাম আছে ?

দুই মাস্টার মশাই এ-ওর মুখের দিকে চাইলেন। ওঁরা অনেক খবর জানেন, কিন্তু—

খাঁড়া মশাই একটু হাসলেন : আচ্ছা বলুন দেখি, বাংলা দেশের কোন্ কোন্ জেলায় বেশি আখের চাষ হয় ?

বিমলবাবু বললেন, মুর্শিদাবাদ।

—আর ?

দু'জনেই চুপ।

—বলতে পারেন, আমাদের এই কাঁসাই নদীর ধারে—এই জেলায় ক্যা ক্যা গঞ্জ আছে ?

তিন নম্বর খাঁড়ার ঘা। বিদ্যের জাহাজ দুই মাস্টার মশাই স্রেফ বোবা বনে গেলেন।

মিটমিট করে হাসলেন খাঁড়ামশাই : আপনারা দুই জাঁহাবাজ পণ্ডিত হয়ে নিজের বাংলা দেশ, নিজের জেলার এটুকু খবর বলতে পারলেন না, আর চিচিঙ্গে কেরলের রাজধানী কিংবা কোথায় কয়লা আর পেট্রোল পাওয়া যায়—তা লিখতে পারল না বলেই ফেল হয়ে যাবে ? আচ্ছা, এবার অঙ্কে আসুন। এই যে—

আতঙ্কে হেডমাস্টার মশাইয়ের দম আটকে এল. এর পরে যদি কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া, মণকষা কিংবা শুভঙ্করের ফাঁকি নিয়ে পড়েন, তাহলে আর দেখতে হবে না। হাত জোড় করে বললেন, ঠিক আছে—আমি এক্ষুনি গিয়েই হংসবদনকে প্রমোশন দিয়ে দিচ্ছি। মানে, আমাদেরই ভুল হয়ে গিয়েছিল।

—প্রমোশন দেবেন ?—বংশীবদনের কপাল কুঁচকে গেল : কেবল চিচিঙ্গেকেই ?

—আজ্ঞে আপনার ছেলে—

—আমার ছেলে বলে পীর হয়েছে নাকি ? ওটা তো একটা

শেয়ালের বাচ্চা। ওকে একা কেন—দিতে হলে সবগুলোকেই দিতে হয়। যারা গোল্লা খেয়েছে, তাদেরও। পারবেন ?

মাস্টার মশাইরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

—একটা কাজ করুন। সবগুলোকে কেলাসে তুলে দিন। যারা পাশ করেছে, একেবারে ডবল প্রমোশন দিয়ে দিন তাদের। বাপ্‌রে—কী বিদ্যে! যারা গঙ্গানদীর উৎপত্তি থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছবি এঁকে দেখাতে পারে—সব শহর-গঞ্জের খবর দিতে পারে, তারা সামান্যি লোক!

খুক খুক করে একবার কাশলেন হেডমাস্টার।

—আজ্ঞে, বোর্ডের নিয়ম মেনে তো আমাদের পড়াতে হয়। এ-সব করতে গেলে স্কুল তুলে দেবে।

খাঁড়ামশাই বললেন, দিক তুলে। যে শিক্ষে দেশ-গাঁয়ের খবরটুকুও জানায় না, তা থাকলেই কি আর গেলেই কি। তাহলে তাই করুন। যারা ফেল হয়েছে, সব পাশ। যারা পেট্রোল আর কয়লার খবর দিয়েছে, তাদের ডবল প্রমোশন। যান।

মামলা মিটিয়ে দিলেন বংশীবদন। তারপর খাতা খুলে আবার দু'শো বত্রিশ মণ ঝোলা গুড়ের হিসেব মেলাতে বসে গেলেন।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দুই মাস্টার মশাই কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর বিমলবাবু আস্তে আস্তে ডাকলেন: খাঁড়ামশাই ?

অন্যমনস্কভাবে বংশীবদন বললেন, আবার ক্যা হলো ?

—আমি একটা কথা বলব ?

—নিশ্চয়—নিশ্চয়।

—মই বেয়ে ওঠার সময় লোকে ওপরে তাকায়, না নীচের দিকে ?

—নীচে তাকাবে কেন, ওপরেই তাকায়।

—আর ওপরে উঠে কাছের জিনিস দেখে, না দূরের ?

—ওপরে উঠলে দূরেই তো চোখ যায়। কিন্তু একথা কেন ?

—বলছি। বিদ্যে হলো সেই মই। ওপরে যত উঠবে তত দেশ-বিদেশের খবর জানবে সে। কোথায় গঙ্গার উৎপত্তি, কোথায় কেরোসিন-পেট্রল, কেরলের রাজধানী কী, ইত্যাদি।

বংশীবদন হাসলেন: বুঝেছি আপনার কথাটা। কিন্তু মইটা যে মাটির ওপর—মানে দেশ-গাঁ, সে মাটিটাকে কে চেনাবে ?

—খাঁড়ামশাই, শিক্ষা তো কেবল স্কুলের জিনিস নয়। তার অর্ধেক ঘরে, অর্ধেক স্কুলে। আপনি জ্ঞানী লোক, এত বড়ো ব্যবসায়ী—আপনার ছেলেকে কি আপনি শেখাবেন না, আমাদের থানায় ক'টা গ্রাম, কাঁসাইয়ের ধারে কী কী গঞ্জ ? আপনি কি তাকে চেনাবেন না চারদিকের কোন্ গাছের কী নাম, কোন্‌টা কী ফুল, কোন্ পোকাটা কোন্ জাতের ? আপনারা শেখাবেন ঘরের খবর, আমরা বাইরের। অভিভাবক যদি তাঁর কাজ না করেন, আমরা কতটুকু পারি বলুন। এই ঘরের শিক্ষাটা আমরা পাইনি বলেই তো আপনার কথার জবাব দিতে পারিনি। আপনারা এই সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দিন, আমরা সারা দুনিয়াকে চিনিয়ে দিই। আপনি তো গুড়ের ব্যবসা করেন, আপনার ছেলেও কি জানে—বাংলা দেশের কোথায় কোথায় আখের চাষ হয় ?

একটু চুপ করে থেকে হা-হা করে হেসে উঠলেন খাঁড়ামশাই।

—ঠিক বলেছেন। এ তো আমাদেরই কাজ। আপনারা মই দিয়ে তুলবেন ওপরে, আমরা ভালো করে নীচের মাটিটাকে চিনিয়ে দেবো। হুঁ, আমারই ভুল হয়েছে। আজ থেকেই আমি চিচিঙ্গেকে নিয়ে পড়ব। ফেল করিয়েছেন, বেশ করেছেন—কেরলের রাজধানীর

খবর দিতে না পারলে আরো সাতবার ফেল করিয়ে দেবেন। তারপর দেখি আমি ওই হতচ্ছাড়াকে নিয়ে কী করতে পারি।

বলেই চিৎকার ঃ

ওরে ভূষণ, শিগ্‌গীর মাস্টার মশাইদের জন্যে ভালো করে জলখাবার নিয়ে আয়। ওঁরা অনেক খেটে খুটে এসেছেন।—বলে নিজেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে গেলেন ভেতরে।

হেড মাস্টারের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

—বাঁচালে বিমল, যা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছিলেন খাঁড়া-মশাই!

বিমলবাবু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

—না স্যার, উনি আমাদেরও চোখ খুলে দিয়েছেন। আজ বুঝতে পারছি, এতগুলো ডিগ্রী পেয়েও নিজের দেশকে আমরা কিছুই চিনিনি। সব আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে।

নাম রহস্য



আমার জ্ঞাতি ভাই গজানন গাঙ্গুলী ফোঁৎ করে নাক দিয়ে আওয়াজ করলেন একটা। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছাগলের কী কী নাম হতে পারে হে প্যালারাম?'

এমন একটা বেয়াড়া প্রশ্নে আমি ঘাবড়ে গেলুম। ছাগলের কী নাম হতে পারে এ নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি। পরীক্ষায় এরকম কোশ্চেন কোনোদিন আসেনি।

আমি ঘাড়-টাড় চুলকে বললুম, 'ছাগলের নাম কী আর হবে! যারা বাঁদর নাচায়, তাদের সঙ্গে তো প্রায়ই একটা ছাগল থাকে দেখি। তারা তাকে গঙ্গারাম বলে ডাকে। আমার ধারণা, সব ছাগলেরই নাম গঙ্গারাম।'

বিকট মুখ করে গজাননদা বললেন, 'তোমার মুণ্ডু! নিজের নাম প্যালারাম, তাই গঙ্গারাম ছাড়া আর কীই বা ভাববে তুমি? অথচ তুমি না পরীক্ষায় বাংলায় লেটার পেয়েছিলে?'

বাংলায় লেটার পাওয়াটা খুব অন্যায় হয়ে গেছে আমার, স্বীকার করতে হলো সেকথা। ছাগলের নাম কী কী হতে পারে এ যার জানা নেই, তার লেটার পাওয়ার এক্তিয়ার নেই কোনো।

আমার খুব অপমান বোধ হলো। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'ছাগলের কী আবার নাম হবে? রুমকি, টুমকি, মেনি—'

যেই মেনি বলেছি, গজাননদা অমনি ক্যাঁচ করে উঠলেন।

'মেনি? তোমার মাথা! মেনি তো একচেটে বেড়ালের নাম, ছাগলের হবে কী করে? বোর্ডের উচিত, তোমার লেটারটা কেটে দেওয়া।'

এবার আমি চটে গিয়ে বললুম, 'তা হলে আপনিই বলুন না, ছাগলের কী কী নাম হয়?'

'আমিই যদি জানব, তাহলে তোমায় জিজ্ঞেস করব কেন হে? ভেবেছিলুম তোমার একটু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছ, তুমি একটা বাতলে দিতে পারবে! এখন দেখছি তোমার মাথায় স্রেফ ড্রায়েড্ কাউ ডাং—অর্থাৎ কিনা ঘুঁটে।'

বৌদি বাড়ির ভেতরে তালের বড়া ভাজছেন, বাতাসে তার প্রাণকাড়া গন্ধ আসছে। বৌদি আবার বলে গেছেন, দুটো তালের বড়া খেয়ে যেয়ো প্যালারাম, তালক্ষীরও করে রেখেছি। এসব

জটিল ব্যাপার না থাকলে অনেক আগেই উঠে পড়তুম আমি—ছাগলের নাম নিয়ে এ অপমান কে সহ্য করত এতক্ষণ!

আমি বললুম, 'আপনিই বা এ নিয়ে এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ছাগলের নাম যা খুশি হোক না, আপনার তাতে কী! আপনি তো আর ছাগল পোষেন না।'

গজাননদা থেমে থেমে একটা আধপোড়া দেশলাইয়ের কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে চটপট বাঁ কানটা চুলকে নিলেন। তারপর মুখ বাঁকা করে বললেন, 'ঘাবড়াচ্ছি কেন? আরে—টু হাণ্ড্রেড্ অ্যাণ্ড ফিফ্‌টি রুপিজ।'

'অ্যাঁ!'

'অ্যাঁ আবার কী! আড়াইশো টাকা। ক্যাশ।'

'কার টাকা? কিসের ক্যাশ?'—আমি কাকের মতো হাঁ করে চেয়ে রইলুম গজাননদার দিকে।

'অমন জগদ্দল একটা হাঁ করেছ কী বলে?'—গজাননদা এবার ডানদিকের কানটা চুলকোতে লাগলেন: 'টাকা আমার ব্রহ্মময়ী মাসিমার। তাঁরই ক্যাশ।'

তালের বড়ার সঙ্গে বেশ উৎসাহ বোধ করতে করতে আমি ঘন হয়ে বসলুম।

'কিছু বুঝতে পারছি না, খুলে বলুন।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে গজাননদা সবটা বিশদ করলেন।

মেসোমশাই অনেক টাকা রেখে অনেক দিন আগে স্বর্গে গেছেন। ব্রহ্মময়ী মাসিমা সেই টাকা দিয়ে এতদিন তীর্থ-টীর্থ করছিলেন। মেসোমশাই নামকরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন, অনেক শিষ্যও তাঁর ছিল। সেই শিষ্যদের একজন হালে মাসিমাকে একটা ছাগলছানা দিয়ে গেছেন প্রণামী হিসেবে।

এখন মাসিমার তো ছেলেপুলে নেই—এই ছাগলছানাটাকে ভীষণ ভালবেসেছেন তিনি। এর জন্যে স্পেশ্যাল ছোলা-কলা বরাদ্দ, মায় ছোট্ট একটা খাট—তাতে নেটের মশারি পর্যন্ত। কিন্তু মুশকিল হলো, এমন আদরের ছাগলের জন্যে কোনো নামই তিনি ঠিক করতে পারছেন না। এর এমন একটা নাম চাই যে শুনলে কান জুড়িয়ে যাবে, প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। তাই ব্রহ্মময়ী মাসিমা ডিক্লেয়ার করেছেন, তাঁর ছাগলের জন্যে নাম যে ঠিক করে দেবে—তাকে তিনি আড়াইশো টাকা প্রাইজ দেবেন। ক্যাশ!

ছাগলের এই আপ্যায়ন শুনে পিত্তি জ্বলে গেল আমার। মনে মনে ভাবলুম, শ্রীমান প্যালারাম না হয়ে ব্রহ্মময়ীর ছাগল হতে পারলে জন্মটা সার্থক হতো।

গজাননদা বললেন, 'বুঝলে, সেই জন্যেই—'

বললুম, 'ওপন কম্পিটিশন গজাননদা?'

'উঁহু!'—ঠাণ্ডা জল ছিটিয়ে গজাননদা বললেন, 'তুমি যদি প্রাইজটা মেরে দেবার তালে থাকো, তা হলে সে গুড়ে বালি! কম্পিটিশন মাসিমার বোনপোদের মধ্যে স্ট্রিক্‌ট্‌লি রেস্ট্রিক্‌টেড্‌। আর তাও কি কম নাকি?

ব্রহ্মময়ী মাসীকে ছেড়ে দিয়ে—আমার মা আর বাকী পাঁচজনের ছেলেমেয়ে নীট্‌ বত্রিশজন! জানো তো আমার দু' বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের বলেছিলুম যে, তোরা পার্টিসিপেট করিসনি—তা হলে দু'জন কম্পিটিটর কম হয়, তা তারা বললে, আড়াইশো টাকা যদি ফাঁকতালে পেয়ে যাই, ছাড়ব কেন? কি রকম মীননেস্‌ দেখেছ?'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়।'

'তা হলে প্যালারাম—' কাতর হয়ে গজাননদা বললেন, 'দাও না একটা নাম-টাম বলে। বাংলায় যখন লেটার পেয়েছ, তোমার অসাধ্য কী আছে? আর যদি পাই, বুঝেছ প্যালারাম—পঁচিশ টাকা কমিশন দেবো তোমাকে।'

এ-কথা শুনে আমার মনটা নরম হলো একটু। পঁচিশ টাকাই বা মন্দ কী! পাঁচ টাকাই বা কে দিচ্ছে আমাকে!

'শুধু একটাই নাম পাঠাতে হবে?'

'না—সেরকম বাঁধাবাঁধি নেই কিছু।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। অনেকগুলো নাম পাঠিয়ে দিই। একটা লেগে যাবে নির্ঘাত।'

'সে কথা ভালো। আমি কাগজ-পেনসিল নিয়ে আসি বরং।'

গজাননদা কাগজ-পেনসিল আনলে আমি বললুম, 'তা হলে প্রথম অ দিয়েই শুরু করা যাক।'

'অ?'—গজাননদা আঁতকে উঠলেন: 'তোমার মতলব কি হে? গোটা স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ কপচাতে চাও নাকি?'

আমি বললুম, 'ডিস্টার্ব করবেন না। আমার মুড আসছে—লিখে যান। প্রথমে লিখুন অঞ্জনা।'

'অঞ্জনা? অঞ্জনা মানে কী?'

'অঞ্জন মানে কাজল। অঞ্জনা মানে—কাজলের মতো যার রঙ, অর্থাৎ কিনা—কালো!'

'ধুৎ!'—গজাননদা আপত্তি করলেন: 'ছাগলটা মোটেই কালো নয়। লাল-সাদা-কালো-হলদে এসব মিশিয়ে বেশ চিত্তির-বিচিত্তির চেহারা।'

'অ—চিত্তির-বিচিত্তির। তা হলে—তা হলে—অপরূপা।'

'এটা বেশ হয়েছে—' খুশি হয়ে গজাননদা বললেন. 'লেগে যেতে

পারে। দিই পাঠিয়ে।'

ব্যস্ত হবেন না—চান্‌স্‌ নিয়ে লাভ কী? আরো লাগান গোটা কতক। এবারে আ। আ—আ—লিখুন আজীবনী।'

'আজীবনী! সে আবার কী?'

'মানে সারা জীবন বেঁচে থাকবে, এই আর কি! নামের ভিতর দিয়ে আশীর্বাদ করা হলো ছাগলকে!'

গজাননদা বললেন, 'সারাজীবন তো সবাই-ই বেঁচে থাকে, যখন মারা যায় তখন একবারেই মারা যায়। এ নামের কোনো মানে হয় না।'

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আপনি তো বি-কম ফেল, সাহিত্যের কী বোঝেন? যা বলছি লিখে যান। লিখুন আজীবনী।'

আজীবনী লেখা হলো।

'এবারে ই। ই—ই—ই—আচ্ছা, ইন্দ্রলুপ্তা হলে কেমন হয়?'

'ইন্দ্রলুপ্তা?'—গজাননদা খাবি খেলেন: 'সে কাকে বলে? ওতো—ইন্দ্রলুপ্ত মানে তো টাক! এ তুমি কী বলছ প্যালারাম! ছাগলের নাম টাক হলে মাসিমা আমায় প্রাইজ দেবেন?'

'তা হলে ওটা থাক। আচ্ছা ইন্দীবরী?'

'ইন্দীবরী?'—গজাননদা ভুরু কোঁচকালেন।

'ইন্দীবর মানে নীলপদ্ম।'

'নীলপদ্ম? বাঃ—বেড়ে।'—গজাননদা বেশ ভাবুকের মতো হয়ে গেলেন: 'আহা নীলপদ্ম। চোখ জুড়ায়, প্রাণ জুড়ায়। কিন্তু ছাগলটার রঙ তো নীল নয়।'

'তাতে কি হয়েছে? আমাদের নীলিমাদির রঙও তো নীল নয়,

ফুটফুটে ফরসা। পাড়ার কাঞ্চনবাবুর রঙ মোটেই সোনার মতো নয়। স্রেফ কুচকুচে কালো। জানেন তো কবি বলেছেন—নামে কিবা করে—'

গজাননদা ফিল-আপ করলেন: 'ছাগলকে যে নামে ডাকো—ডাকে ব্যা-ব্যা করে। ঠিক, ইন্দীবরীও থাক।'

বললুম, 'এবার উ। লিখুন—উপ্-উপ্-উপ—'

'হনুমানের মতো উপ্-উপ্ করছ কেন?'

'উপেন্দ্রবজ্রা।'—এই জাঁদরেল নাম শুনে গজাননদা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন: 'ভীষণ কড়া নাম হে—উচ্চারণ করতেই হৃৎকম্প হয়! কাকে বলে?'

কাকে বলে সেকি আমিই জানি! কোথায় যেন দেখেছিলুম শব্দটা। বললুম, 'নামে কি আসে যায়, চালিয়ে দিন না। জাঁদরেল নামেরও তো গুণ আছে একটা।'

অনিচ্ছার সঙ্গেই গজানন লিখলেন উপেন্দ্রবজ্রা।

'এবার ঊ। ঊ-ঊ-নাঃ, ঊ বড় বেয়াড়া, ঊর্ধ্বময়ী ছাড়া কিছু মনে আসছে না। আর ঊর্ধ্বময়ী নাম দিলে—'

গজাননদা বললেন, 'মাসিমা ভাববেন—তাঁর ছাগলের ঊর্ধ্ব-লোক, মানে মৃত্যু কামনা করা হচ্ছে। তা হলেই প্রাইজের আশা ফিনিশ! ও সব চলবে না। তা ছাড়া প্যালারাম, তুমি যেভাবে অ-আ-ই-ঈ-চালাচ্ছ—'

'ঈ বাদ দিয়েছি তো। ওতে ঈশ্বরী ছাড়া আর কিছু হয় না।'

'না না, ঈশ্বরী নয়। ঈশ্বরী ছাগল মানে স্বর্গীয় ছাগল, ঊর্ধ্বময়ীও তাই। ডেনজারাস্। আমি বলি কি প্যালারাম—এই স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের প্যাঁচ ছাড়ো—নইলে গোটা দিনেও শেষ হবে না যে!'—

গজাননদা কাতর হয়ে বললেন, 'ওদিকে তালের বড়াগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে !'

তালের বড়ার নামে আমাকেও প্ল্যান বদলাতে হলো !

'তা হলে শর্টকাট করা যাক। লিখুন—ক-এ কুসুমিকা, খ-এ —আচ্ছা খ থাক—গ-এ গরবিনী, ঘ-এ ঘোরাননা ? না—ঘোরাননা বাজে—মাসিমা ভাববেন তাঁর ছাগলের মুখ ঘোড়ার মতো বলা হচ্ছে—চ-এ—চ-এ চিত্রলেখা।'

'না-না, চিত্রলেখা তোমার বৌদির নাম !'—গজাননদা আর্তনাদ করলেন : 'ছাগলের ও নাম দিলে তোমার বৌদি আর রক্ষে রাখবে না, তালের বড়া আর তালক্ষীর একেবারে গেল।'

আমি ভয় পেয়ে বললুম, 'ছেড়ে দিন—ছেড়ে দিন। তা হলে চ-এ চারুপ্রভা, ছ-এ—ছ-এ ছাগলিকা, জ—জ-এ জয়ধ্বজা, ঝ-এ—ঝ-এ ঝঞ্ঝিকা—'

'ঝঞ্ঝিকা—ঝড়-টড় নাকি ? না-না, ও-সবের মধ্যে যেয়ো না।' —গজাননদা ছটফট করতে লাগলেন : 'প্লীজ প্যালারাম, শর্টকাট কর—তালের বড়াগুলো—'

'ঠিক—তালের বড়াগুলো।'—আমিও উত্তেজিত হয়ে উঠলুম : 'তা হলে আর বর্ণমালা নয়—অ্যাট র‍্যান্ডম্—মানে যা মনে আসে। লিখে যান—বিচিত্রিতা, নবরূপা, মনোহরা—'

'মনোহরা কি একটা খাবার নয় ? মাসিমা ভাববেন, কে তার ছাগলকে কেটে খাওয়ার—'

'তা হলে মনোরমা। লিখুন পল্লবিকা—পাতা-টাতা খায়—ফুল্লনলিনী—দেবভোগ্যা—'

গজাননদা আবার বাধা দিলে : 'দেবভোগ্যা ? সে তো ঘিয়ের বিজ্ঞাপনে লেখে হে ! তুমি কি ঘি দিয়ে ছাগল রান্না-টান্নার

পরামর্শ দিচ্ছ ?'

'থাক—থাক। লিখুন দেবকন্যা, টঙ্কারিণী, ডামরী—'

'বেজায় শক্ত ঠেকছে।'

'হোক শক্ত। ব্রহ্মময়ী নামটাই বা কি এমন নরম ? অমন নাম যাঁর, কড়া নামেই হয়তো তিনি খুশি হবেন। লিখে যান—শূরসুন্দরী, সুখময়ী —'

লিষ্টি যখন শেষ হলো, তখন পুরো আটাশটা নাম।

আমি বললুম, 'আরো দুটো মনে পড়েছে! য-র-ল-ব-হ-ক্ষ—লিখুন হংসপদিকা, ক্ষুরেশ্বরী—'

'ক্ষুরেশ্বরী ?'

'ক্ষুরের ঈশ্বরী যে। অর্থাৎ কিনা—মাসিমার ছাগলের মতো ক্ষুর আর কোনো ছাগলেরই নেই।'

'রাইট। ক্ষুরেশ্বরী চলতে পারে। কিন্তু প্যালারাম, লিস্ট একটু বড় হলো না ?'

'তা হোক। লটারীতে বেশি টিকেট কিনলে প্রাইজের আশাও বেশি—বুঝতে পারেন তো ? দিন, দিন পাঠিয়ে—একটা লেগে যাবে নির্ঘাত।'

'ফুল-চন্দন পড়ুক তোমার মুখে।'

'ফুল-চন্দনের আগে তালের বড়া পড়া দরকার। আর পঁচিশ টাকা কমিশন।'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়। সে আর বলতে! তবে পঁচিশ টাকা একটু বেশি হলো না প্যালারাম ? যদি কুড়ি টাকা দিই ?'

আমি চটে বললুম, 'বলেন কি ? লিস্ট ফেরত দিন আমার।'

'আচ্ছা—আচ্ছা, পঁচিশ টাকাই থাক। চলো—তালের বড়া খেয়ে আসা যাক।'

বিস্তর খাটুনি হয়েছিল। উৎসাহিত হয়ে তালের বড়া খেতে গেলুম।

খেতে খেতে এবার মিটমিট করে হাসতে লাগলেন গজাননদা।

'কী হলো, হাসছেন যে?'

'জানো, ভূতো এসেছিল কাল।'

'ভূতোদা?'

'হাঁ, আমার আর এক মাসতুতো ভাই। এক নম্বর গবেট। আমার কাছ থেকে আবার নামের সাজেস্‌ন্‌ চায়!'—গজাননদা বললেন, 'তা দিয়েছি বলে।'

'কী বলে দিলেন?'

'আন্দাজ করো দিকি?'—চোখ মিটমিট করতে লাগল তাঁর।

'বলতে পারলুম না।'

'গঙ্গারাম। ও যেমন হাবা গঙ্গারাম—তাতে ও নাম ছাড়া ওকে আর কী দেবো? শুনে খুশি হয়ে চলে গেল। হা—হা—হা—'

শুনে আমিও হাসলুম: 'হা—হা—হা—'

প্রাইজের রেজাল্ট বেরুবে পরের রবিবার। পঁচিশ টাকার আশায় আশায় খবর জানতে গেলুম।

দেখি গজাননদা আরশোলার মত মুখ করে বসে।

'পাননি প্রাইজ?'

'নাঃ!—' হাঁড়ি ফাটার মতো আওয়াজ করে গজাননদা বললেন, 'তোমার ইন্দীবরী—আজীবনী—অপরূপা—ফুল্লনলিনী—হংসপদিকা—সব চিং। প্রাইজ কে পেয়েছে, জানো? ভূতো।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ, সেই গঙ্গারাম! একত্রিশ জন বোনপো-বোনঝি বাংলা ডিক্‌শনারি উজাড় করে দিয়েছিল। মাসীমা বললেন, ছাগলের নামে ও-সব কাব্যি দিয়ে কী হবে! গঙ্গারাম! আহা—মা গঙ্গা, তায় রাম নাম! নাম করতেই পুণ্যি!—বলে, ছাগলটার পায়ে ঢুপ করে একটা পেন্নাম করে প্রাইজটা ভূতোকেই দিয়ে দিলেন।'

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলুম। আজও বাড়ির ভেতর থেকে ভাদ্র মাসের তালের বড়ার গন্ধ আসছিল, কিন্তু বৌদি যে সে বড়া আমায় খেতে দেবেন, সে ভরসা আর হলো না আমার।